দুর্গার ধ্যান

ওঁ জটাজূট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তি দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটীভীষণাননম ॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাং সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রাচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততঃ পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

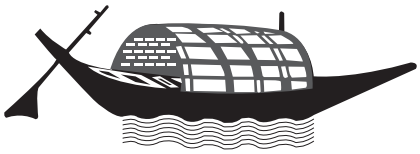

দেবীর নৌকায় আগমন

ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে
ফল : শস্যাবৃদ্ধি ও জলবৃদ্ধি
ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে
ফল : ছত্রভঙ্গ

দেবীর ঘটকে গমন

কার্যকরী কমিটি ২০১৬-২০১৮

BCHCS

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO

Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
&
Bangladesh Canada Hindu Mandir

Executive Committee (EC) 2016-2018

Name	Designation
Shebu Chowdary	President
Chanchal Saha	Vice President
Sajal Deb	Vice President
Arun P. Paul	General Secretary
Himangshu Sarkar	Asst. General Secretary
Achinta Banik	Finance Secretary
Shyamol Sarkar	Asst. Finance Secretary
Dilip Kumar Saha	Organizing Secretary
Uttam Kumar Roy	Cultural Secretary
Bimal Chowdhury	Publication Secretary
Biswajit Mitra	Office Secretary
Satyabrata Purkayastha	School Secretary
Rajesh K. Pramanik	Secretary (Property Mgmt.)
Swapan Kumar Das	Secretary (Poject Mgmt.)
Asit Dutta (Pulak)	Secretary (Puja Mgmt.)
Ajoy Kumar Banik	Secretary (Prosad Mgmt.)
Jhantu Debnath	Secretary (Event Mgmt.)
Sujit Kumar Das	Director
Sujit Das	Director

Board of Trustees (BOT) 2016-2020

Name	Designation
Sabyasachi Chowdhury (Jishu)	Chairman
Borendra Sanyal	Secretary
Ajoy Das	Member
Anil Nath	Member
Ashok Debnath	Member
Bijit Lal Roy	Member
Debobrata Dey (Tomal)	Member
Nirmal Kar	Member
Rajat Paul	Member
Ramapada Paul (Mintu)	Member
Deb Kumar Sarma	Member
Shebu Chowdary	Member
Arun P. Paul	Member
Achinta Banik	Member

Executive committee 2014-2016
President: Shubhash Roy
General Secretary: Borendra Sanyal

Executive committee 2012-2014
President: Shubhash Roy
General Secretary: Chanchal Saha

Executive committee 2007-2009
President: Arun Datta
General Secretary: Ramapada Paul

Executive committee 2004-2005
President: Ajoy Das
General Secretary: Debobrata Dey (Tamal)

Executive committee 2002-2003
President: Shebu Chowdary
General Secretary: Sudip Shome (Rinku)

Executive committee 2000-2001
President: Sudip Dey (Anju)
General Secretary: Bijit Roy

Executive committee 1996-1997
President: Swadesh Saha
General Secretary: Bibekananda Talukder

Executive committee 2009-2011
President: Nirmal Kumar Kar
General Secretary: Shubhash Roy

Executive committee 2005-2007
President: Anil Nath
General Secretary: Samir Lal Datta

Executive committee 2003-2004
President: Anjan Datta
General Secretary: Debobrata Dey (Tamal)

Executive committee 2001-202
President: Kirit Bikram Sinha Roy
General Secretary: Sabyasachi Choudhury

Executive committee 1997-2000
President: Alok Choudhury
General Secretary: Kishore Chowdury

Executive committee 1994-1995
President: Sudhangshu Datta (Suda)
General Secretary: Bibekananda Talukder

Puja Mandap

16 Dohme Avenue, Toronto
ON M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

পুরোহিতবৃন্দ

শ্রী প্রসাদ ব্যানার্জি
শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য
শ্রী মিটন পারিয়াল

সূচিপত্র

বেদ উপনিষদ

বেদের প্রাসঙ্গিকতা	ড. দিলীপ চক্রবর্তী	১৫
গীতায় সমন্বয়	শ্রী বুলবুল ভৌমিক	১৮

দেবদেবী

চণ্ডীচিন্তা	শ্রী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	২৩
শালগ্রাম ও ভগবান শ্রীবিষ্ণু	অন্তরা রায়চৌধুরী	২৪
অকাল-বোধন	স্বামী প্রমেয়ানন্দ	২৫
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য	বিভূতিসুন্দর ভট্টাচার্য	২৬
দীপান্বিতা	পণ্ডিত প্রবর জ্যোতির্ময়	২৮
দীপাবলী	শ্রীশ্রী আনন্দ মূর্তি	২৯
বসন্ত পঞ্চমী হয়ে উঠল নিবেদিতা পঞ্চমী	সুচেনা সরকার	৩০
শিবরাত্রি মোটেই মেয়েলি ব্রত নয়	ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী	৩১
দেবী কালী নানা রূপে, নানা মনে	হরপ্রসাদ সেনশর্মা	৩৩
Durga Ma	Sulov Deb	৩৫
Women Empowerment and its significance with Maa Durga	Dia Sanyal	৩৬

সনাতনী বিষয়

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব শ্রীকৃষ্ণ	জয়দেব রায় চৌধুরী	৩৭
সার্বজনীন দুর্গোৎসবের নানা দিক	ড. কাঞ্চন কুমার পুরোহিত	৪০
বরুণাদি	শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪১
সনাতন ধর্মের কিছু তথ্য	দেব কুমার শর্মা	৪৩
শ্রীহট্টের রাজচক্রবর্তী-নবদ্বীপের নবদ্বীপচন্দ্র-ভারতের ভারতপ্রদীপ-বিশ্বপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	রেখা পাঠক	৪৭
Numerical Notations and the Mystery of Zero	Robert K. Logan, Ph.D.	৫০
Why we Pray and offer food to GOD	সম্ভূজানন্দ দাস (স্বপন সমাদ্দার)	৫৪
প্রশ্ন-উত্তরে হিন্দুধর্ম	ফল্গু দাসগুপ্ত	৫৭
সন্ন্যাসী ও রাজনর্তকী	সারদা সরকার	৬১
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে অর্জুন ও উদ্ধবের সাক্ষাৎকার	কান্তি বন্ধু ব্রহ্মচারী	৬৫
সনাতন ঃ সার্বজনীন ধর্ম	রামকৃষ্ণ তালুকদার	৬৭

সনাতনী প্রথা

রাস উৎসব	[সংকলিত]	৬৯
দোলযাত্রা ও মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	চৈতন্যময় নন্দ	৭১
পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষ	স্বামী হরিময়ানন্দ	৭৩
সিঁদুর খেলা	শতরূপা সান্যাল	৮১
বর্ষপ্রবেশ, সঙ্গে গণেশ	জয়ন্ত কুশারী	৮২
হারিয়ে যাচ্ছে দিদিমা-ঠাকুমা–হারাচ্ছে পৌষপার্বণের অনেক পিঠেও	রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮৪
Anna Prashan, Food & Hunger	Dr. Sourendra K. Banerjee	৮৬
Puja/Broto List for Bangla-1424	–	৮৮

ধর্মীয় স্থান

কাশীর বিশ্বনাথ	হরদাস ভট্টাচার্য্য	১০৫
আগরতলা-চতুর্দশ দেবতার মন্দির	সন্দীপন মজুমদার	১০৮

মহাত্মার জীবনী

শ্রীশ্রী রামঠাকুর	অরুনাংশ হোর	১১২

বিবিধ

Humanity, Human Rights & Hindu Religion	Nani Gopal Debnath	১১৬
বিগ ব্যাং-এর পরের সেকেণ্ডে পৌঁছে কী দেখলেন বিজ্ঞানীরা?	সুজয় চক্রবর্তী	১১৯
বাংলার তিন রানি	বারিদবরণ ঘোষ	১২৩
চিরকালের পুজো তখন এবং এখন	প্রফুল্ল রায়	১৩০
নৈতিকতা-ধর্মে ও সাহিত্যে	ড. সুজিত দত্ত	১৩২
Hindu Mathematics and Astronomy	Prasad Banerjee	১৩৫

কবিতাঙ্গন

ছদ্মবেশী	ঋতুশ্রী ঘোষ	১৩৬
শুভ্র জীবন	পূরবী পাল	১৩৬
মানুষের মূল্য	শিব চক্রবর্তী	১৩৭
Mothers' Day	Dr. Dilip Chakraborty	১৩৮
কল্যাণময়ী মা দুর্গা	মৃণাল কান্তি মজুমদার	১৩৯

Publication Secretary : Bimal Chowdhury
Publishers : Bangladesh Canada Hindu Cultural Society, Toronto
Bangladesh Canada Hindu Mandir, Toronto
16 Dohme Ave., Toronto, ON. M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444
Published Date : September 2017
Cover : Mahua
Phone: (416) 319-7345, Toronto, Canada
Graphics & Printing : Sufala Printers
49/4-A R K Mission Road
Dhaka-1203, Bangladesh
Cell: +880 1715 295843
Email: sufala.printers@gmail.com

বিঃ দ্রঃ এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, অন্যান্য লেখা ও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পেছনে যাঁরা আমাদের আর্থিক, কায়িক, নৈতিক এবং সার্বিক সমর্থন দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতায় :
শ্রী মহাদেব চক্রবর্তী
ড. দিলীপ চক্রবর্তী
শ্রী কিরীট বিক্রম সিংহ রায়
বিশেষ সহযোগীতায় :
শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক, বাংলাদেশ

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR TORONTO

SHARODIYA GREETINGS FROM EXECUTIVE COMMITTEE

Our largest religious festival 'Durga Puja' is at the corner as always. The advent Ma Durga in this world is always a great inspiration for us to fight against evils and build a peaceful and joyful society.

At this cheerful moment, we would like to convey our sincere thanks and gratitude to all our community members, devotees and patrons for their all-out support to our year-round various social and religious programs.

Our heartfelt thanks in advance for your support to our largest festival Durga Puja! We convey our gratitude to all donors. We are thankful to all the volunteers who devoted so many hours of their valuable time in prosad preparation, cultural programs, decoration, safety and security, donation collection, Puja management, neatness and cleanliness, etc. Without the dedication of our volunteers, it is quite impossible to organize and manage these huge programs successfully.

Our special thanks to all the members of publication committee for their hard work to publish this colorful and resourceful 'Chinmoyee'!

May Ma Durga Bless us all!

Sincerely,

On behalf of Executive Committee

Shebu Chowdary
President

Arun P Paul
General Secretary

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR TORONTO

শারদীয় দুর্গাপুজা ২০১৭ উপলক্ষে

বোর্ড অব ট্রাস্টির নিবেদন

দেখতে দেখতে আবার এসে গেল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৭। এই মহোৎসব একদিকে যেমন ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনই এর সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ কানাডা হিন্দুমন্দির ও বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটির পক্ষ থেকে মন্দিরে আগত সকল সম্মানিত ভক্তবৃন্দ ও সুধীজনকে শ্রেণীমত জানাই শারদীয় দুর্গাপুজা-২০১৭ -এর প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। এই মন্দির আপনাদের সকলের। আপনাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা বা অবকাশ নাই। আমাদের মন্দিরের সার্বিক প্রয়োজনে আপনারাই আমাদের একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল। বছরের এই সময়টাতেই সর্বাধিকভাবে আপনাদের সাক্ষাত, সহযোগিতা ও সাহচর্য পাই। তাই এই সময়টাই আপনাদের শুভেচ্ছা জানানোর উপযুক্ত সময়।

এই মহোৎসব আমাদের অন্তরের আসুরিক প্রবৃত্তিকে দমন করে অন্তরে জাগিয়ে তোলে মহামিলনের এক অভুতপুর্ব অনুভুতি। ধনী, গরিব, ছোট, বড় সবাই যে যার সাধ্যমত ও শ্রেণীমত অন্তরের অন্তস্থল থেকে আদান-প্রদানে সচেষ্ট থাকে। ধর্মীয়ভাবে মায়ের প্রতি আমাদের ভক্তি ও পুষ্পাঞ্জলী, গুরুজনদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ ও ভক্তি, সমবয়সীদের প্রতি শুভেচ্ছা এবং ছোটদের প্রতি আমাদের ভালবাসা এ সবের মধ্যেই এই মহামিলনের পুর্ণতা। আমরা কেউই এই সকল আনুষ্ঠানিকতার বাহিরে নয়।

পরিশেষে, মা দুর্গার কাছে আমাদের কায়মন বাক্যে প্রার্থনা থাকবে, তিনি যেন, আমাদেরকে বর্তমান সমাজের মহিষাসুর রূপি দানব ঘৃণা, প্রতিহিংসা, ধর্মের নামে মানুষ খুন, বিভেদ, হানাহানি নির্যাতন ইত্যাদি দমনের শক্তি প্রদান করেন। আমাদের সমাজের সকলকে সুন্দর, সুস্থ, সুখে, শান্তিতে ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ রাখেন।

বোর্ড অব ট্রাষ্টির পক্ষ থেকে মন্দিরের সকল স্বেচ্ছাসেবী ও ভক্তবৃন্দকে তাদের অবদান ও অনুদানের জন্য জানাই ধন্যবাদ এবং শারদীয় শুভেচ্ছা।

একই সাথে সমাজের সকলকেও জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।

"ওঁ সর্বে ভবন্ত সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়।"

বোর্ড অব ট্রাষ্টির পক্ষ থেকে
বিজিত রায়
ও
বরেন্দ্র স্যানাল।

DURGA PUJA – 2017 SUB-COMMITTEE

SUB-COMMITTEE: FINANCE

1. Achinta Banik, Finance Secretary (Co-ordinator)
2. Shyamal Sarker
3. Deb Kumar Sarma
4. Ajoy Das
5. Bijit Roy
6. Biswajit Dutta
7. Satyabrata Purkayastha
8. Chayan Das
9. Sujit Das

SUB-COMMITTEE: CULTURAL

1. Uttam Kumar Roy, Cultural Secretary (Co-ordinator)
2. Chayan Das
3. Chanchal Saha
4. Shubhash Roy
5. Bibek Sen Rajib
6. Mukti Prasad
7. Samir Lal Dutta

SUB-COMMITTEE : PUBLICATION

1. Bimal Chowdhury, Publication Secretary (Co-ordinator)
2. Chanchal Saha
3. Kirit Bikram Sinha Roy
4. Nirmal Kar
5. Sujit Das
6. Satyabrata Purkayastha
7. Chayan Das
8. Mrityunjoy Saha

SUB-COMMITTEE : PRASAD MANAGEMENT

1. Ajoy Banik, Prasad Management Secretary (Co-ordinator)
2. Anil Nath
3. Sajal Deb
4. Rajesh Pramanik
5. Satyabrata Purkayastha
6. Himangshu Sarkar Tinku
7. Liton Ghose
8. Mrityunjoy Saha
9. Borendra Sanyal
10. Sabyasachi Chowdhury
11. Shubhash Roy
12. Asit Dutta Pulak
13. Subodh Das
14. Bimal Chowdhury
15. Dilip Saha
16. Moyna Das
17. Ashok Dutta
18. Bikas Das
19. Nipu Chowdary
20. Parimal Debnath
21. Swapan Kumar Das
21. Apu Das
22. Tablu Das
23. Kinku Das
24. Nakul Dey
25. Sanjoy Ghose
26. Chapal Routh
27. Aniruddha Bhadra

SUB-COMMITTEE: EVENT MANAGEMENT AND DECORATION

1. Jhantu Debnath
   Event Management Secretary (Co-ordinator)
2. Rajesh Pramanik
3. Anil Nath
4. Ratan Roy
5. Utpal Debnath
6. Shukla Nath
7. Karabi Debnath
8. Aparna Agarwal
9. Bijoy Parial

SUB-COMMITTEE : PUJA MANAGEMENT

1. Asit Dutta (Pulak)
   Puja Management Secretary (Co-ordinator)
2. Ira Datta
3. Anita Sarkar
4. Biva Roy
5. Chapala Nath
6. Shubhona Das
7. Shukla Nath
8. Krishna Dey
9. Mita Saha
10. Sanchita Roy
11. Aparna Banik
12. Subarna Banik
13. Manashi Paul
14. Mira Chowdary
15. Nirmal Kar
16. Dipika Ghose
17. Jayanta Kumar Singha
18. Shyamoli Deb
19. Pinki Kanoongo
20. Ajoy Banik
21. Biswajit Mitra
22. Joyshree Das

SUB-COMMITTEE: PROJECT MANAGEMENT

1. Swapan Kumar Das
   Project Management Secretary (Co-ordinator)
2. Deb Kumar Sarma
3. Nirmal Kar
4. Chanchal Saha
5. Borendra Sanyal
6. Dr. Khokan Kanti Das

DURGA PUJA SOMONNOY COMMITTEE

1. Shebu Chowdary
2. Bijit Roy
3. Arun Paul
4. Deb Kumar Sarma
5. Ajoy Das
6. Chayanika Dutta
7. Anil Nath
8. Rajat Paul
9. Sabyasachi Chowdhury Jishu
10. Debobrata Dey
11. Ashok Debnath
12. Nirmal Kar
13. Shubhash Roy
14. Ramapada Paul
15. Ira Datta
16. Shukla Nath

সম্পাদকীয়

"আশ্বিনের মাঝামাঝি, উঠল বাজলো বাজি,
পূজার সময় এলো কাছে
মধু, বিধু দুই ভাই, ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দুহাত তুলি নাছে।"

আশ্বিনের এই যে ঢাকের বাজনা এটা শুধু বাইরেই বাজে না, আমাদের অন্তরে ও বাজে। শুধু ছোট ছেলে মধু, বিধুই আনন্দে দু'হাত তুলে নাচে না, আমরা বড়রাও অন্তরের আনন্দে নাচি হয়তো দুহাত তুলেনা। কি সেই কারণ, কি সেই প্রেরণা, যা আমাদের মনকে আন্দোলিত করে, শরীরকে উদ্বুদ্ধ করে, আবেগকে সুসংহত করে।

এই কি সেই অকালবোধন, যার কারণে আমরাও আমাদের অন্তরের শুভশক্তিকে অকাল বোধন করে জাগ্রত করি, আমাদের আগামীকালকে সুন্দর, সার্থক করার জন্য আমরা জানি যে অতীতের অভিজ্ঞতায়, বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষৎ গড়ার নামই জীবন। মাতৃবোধনের মুহূর্ত্তে-এই সেই বিরল মুহূর্ত্ত যখন আমরা অতীতের ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী জীবনকে সার্থক করার প্রতিজ্ঞা করি। মা দূর্গা দুর্গতি নাশিনী তাঁর আশীর্বাদে আমাদের দুর্গতি নাশ হবে। জীবনের আকাশে ঘনায়মান কালো মেঘ সরে গিয়ে উজ্জ্বল, নীল আকাশ আবার শিশুর মতন হাসবে।

মা দুর্গার অসুর বধ এই অসুরতো শুধু বাইরেই নেই। আমাদের ভিতরেও তো আছে - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য - এই তো সেই অসুর, অসুরনাশিনী মা দুর্গার আশীর্বাদে আমরা ও আমাদের ভেতরের এই অসুরকে সংহার করে আমাদের জীবন সার্থক করব- এই প্রতিজ্ঞাই আজকে আমরা আমাদের আরাধ্যা জগজ্জননী দুর্গামায়ের কাছে করব। ঈশ্বর আমাদের সবই দিয়েছেন বিবেক, বৈরাগ্য, সেবা, ভালবাসা। আমাদের কাজ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেই মহান দানকে নিজের অন্তরে অনুভব করা এবং তাঁকে জাগ্রত করা। তাহলেই আমরা সত্যিকারের মানুষ হতে পারবো এবং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে গর্ব করতে পারবো।

মহান লগ্ন আগত। মন্দিরের দরজা খুলে গেছে। সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি শুরু হয়েছে। তাই আমাদের সকলকে কবি গুরুর আহ্বান।

"এখন যার যা কিছু আছে ঘরে
সাজা পূজার থলিরে পরে
আত্মদানের উৎস ধারায় মঙ্গলঘট ভরগো।"

আসুন আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মায়ের সমস্ত সন্তান এক সাথে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি

"তব কাছে মাগো, কিছু নাহি চাবো, শুধু দিও এই বর,
যেন সকলের তরে প্রেম জাগে মনে, না মানি আত্মপর।
বিদায় বেলায় দীন অধমের এই মিনতি রেখো,
আমাদের ঘরে শুধু তিন দিন না, আরো কিছুদিন থেকো।"

মন্দির প্রতিষ্ঠান সময় থেকে আপনাদের সকল শুভ প্রচেষ্টায় আপনারা যে স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন তা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। চিন্ময়ী প্রকাশনায় আছে অগনিত ভক্তের অর্থ ও শ্রমদান, বিজ্ঞাপনদাতাদের আর্থিক সহযোগীতা। চিন্ময়ীর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সর্বদা দেখেছেন এবং এবার ও আমরা আপনাদের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবোনা। এই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এবারের মত বিদায় নিচ্ছি।

বিমল চৌধুরী

THE GOVERNOR GENERAL · LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Canada is famed for its diverse society in which the celebration and sharing of one's heritage are central features of our collective identity. The Autumn Festival of Durga Puja, hosted by the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society, is a wonderful showcase of the culture and customs that add so much to the fabric of our country.

I applaud the organizers and volunteers for their efforts in bringing this festival to fruition. May you all enjoy a memorable experience.

David Johnston

September 2017

1 SUSSEX DRIVE · 1, PROMENADE SUSSEX
OTTAWA · CANADA · K1A 0A1 · WWW.GG.CA

PRIME MINISTER · PREMIER MINISTRE

September 25–30, 2017

Dear Friends:

I am pleased to extend my warmest greetings to the members of the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and Bangladesh-Canada Hindu Mandir as you celebrate Durga Puja.

Durga Puja, one of the most important festivities in the Bengali Hindu calendar, commemorates the victory of good over evil. This event brings family and friends together to celebrate peace, hope and self-renewal, and I am certain that you will all rejoice in the many observances planned to mark this special occasion.

I would like to commend the members of the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and Bangladesh-Canada Hindu Mandir for their commitment to promoting fellowship in the community. Your contributions stand as an important reminder that our country is made great not in spite of its diversity, but because of it.

On behalf of the Government of Canada, I wish you a very happy Durga Puja.

Sincerely,

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

Ontario

Premier of Ontario - Première ministre de l'Ontario

September 25 – 30, 2017

A Personal Message from the Premier

On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to extend warm greetings to our Bengali Hindu community as you celebrate Durga Puja.

Today, you honour the Goddess Durga with one of the most joyous and spectacular festivals in South Asia and in Hindu communities around the world. Across Ontario, Bengali Hindu communities pay tribute to Durga's victory over evil through music and song, through art, and through feasts with family and friends.

For the faithful, this is a chance to reunite with loved ones and to renew your faith. The symbolism of good triumphing over evil remains as powerful as ever as the world strives to make peace across cultural and economic divisions.

Ontario is proud to be home to a vibrant Bengali Hindu community whose faith enshrines the ideals of service, pursuit of wisdom and respect for all religions — values that help strengthen Ontario's multicultural success story.

I thank the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and the Bangladesh-Canada Hindu Mandir for hosting this festival and for their commitment to the spiritual and social well-being of Bengali Hindus.

Have a blessed and joyous Durga Puja!

Kathleen Wynne
Premier

Nathaniel Erskine-Smith, M.P.
Beaches-East York

Dear Torontonians and visitors, September, 2017

It is an honour to welcome you to Durga Puja -the Autumn Festival!

Aimed to celebrate and promote Bengali Hindu heritage and culture and to bring Canadians together to pay homage to Durga, the occasion provides an opportunity to express this peaceful message by enjoying the festival with family and friends. I am pleased to send my congratulations and greetings in this souvenir booklet published to mark the occasion.

I have a huge amount of admiration for the valuable work the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and the Bangladesh-Canada Hindu Mandir does serving the South Asian communities in Toronto.

This Autumn Festival has required a tremendous amount of effort, organizing and hard work. On that note, I would like to thank the organizing team and all the volunteers involved in creating such an incredible event.

Please accept my best wishes on this festive occasion.

Sincerely,

Nathaniel Erskine-Smith

Constituency Office
1902 Danforth Ave
Toronto, ON
M4C 1J4
416 467 0860

House of Commons
802 - Justice Bldg.
Ottawa, ON
K1A 0A6
613 992 2115

ARTHUR POTTS, MPP

Beaches–East York

September 2017

It is my great honour to bring greetings on behalf of the Government of Ontario and my Constituency Office staff to the members of Toronto's Bengali Hindu community, as you mark the celebration of Durga Puja.

I often speak to constituents about the valuable contributions to our riding and our province being made by members of the Bengali community. I hope that we can continue to grow our relationship in the months and years ahead. The raising of the Bangldesh flag at Queen's Park and the marking of March as Bangladesh Heritage Month are just small ways for us, as a government, to show our appreciation.

I would like to take this opportunity to congratulate both the Bangladesh-Canada Hindu Mandir and the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society for their commitment to building a strong Bengali Hindu community within a diverse and dynamic Ontario, and wish you all the best for another successful Durga Puja festival.

Enjoy!

Arthur Potts, MPP
Beaches-East York

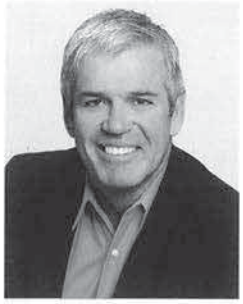

Constituency Office 1821 Danforth Avenue, Toronto, ON M4C 1J2
Tel 416-690-1032 | Fax 416-694-1996 | Email apotts.mpp.co@liberal.ola.org

Janet DAVIS

City Councillor
Ward 31
Beaches-East York

SARAH BUCHANAN
Executive Assistant

OHANA OLIVEIRA
Constituency Assistant

LAURA NGUYEN
Constituency Assistant

VICTORIA OCCHIPINTI
Constituency Assistant

Toronto City Hall
100 QUEEN STREET WEST
SUITE C57, TORONTO ON
M5H 2N2
Tell: 416.392.4035
Fax: 416.397.9289

East York Civic Centre
850 Coxwell Avenue
Toronto, ON
M4C 5R1
Tell: 416.397.4870

councillor_davis@toronto.ca

Twitter @Janet_Davis

www.JanetDavis.ca

Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society
& Bangladesh-Canada Hindu Mandir
16 Dohme Avenue
Toronto, Ontario
M4B 1Y9

August 18th, 2017

Dear Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and Mandir,

I would like to extend my best wishes to the Board of Directors and Members of Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and Bangladesh-Canada Hindu Mandir, and to all those celebrating Durga Puja in Toronto.

Around the world, Durga Puja is recognized as an important time of celebration with family, friends and community. Thanks to the work of your organization, Bengali Hindus in Canada have an opportunity to gather together and share this important cultural tradition. Durga Puja also provides an opportunity for people from other backgrounds to learn and better understand the values and beliefs of the Bengali Hindu community.

The City of Toronto proudly states that cultural diversity is our strength. Events like Durga Purga strengthen communities and contribute to the cultural fabric of our society. As your City Councillor, I am honored to be invited to this event and to join you in this celebration. I look forward to meeting you at the festivities.

Subha Durga Puja,

Janet Davis

Councillor Janet Davis
Ward 31, Beaches-East York

Vedanta Society of Toronto

(Ramakrishna Mission)

120 Emmett Ave. Toronto ON M6M 2E6 Canada
Tel: (416) 240-7262
E-mail: toronto@rkmm.org
Web: www.vedantatoronto.ca

Message

Divine Mother's worship in autumn as Durga Puja is a big festival for the Hindus throughout the world. For the Bengali Hindu community, it has an added charm. It is the biggest festival of the community. During the Puja days, Mother Durga is believed to come from Her abode in the Himalayas to homes of common men and women in cities, towns and villages. This is an event of great joy expressed through, worship of the Divine in and through the image of Mother Durga. Fasting, contemplation, prayer, offering of flowers, group singing and the vesper service with traditional drums mark the holy occasion. On the social side, meeting with relatives and friends, helping the poor and needy, and a fellow feeling for all human beings and a sense of universal brother hood runs through the heart of everyone. By the power of the Divine Mother, the whole world becomes one's own. No one is treated as alien. Such a feeling of oneness of humanity alone is the source of joy and peace. The Holy Mother Sri Sarada Devi said in her last message, "If you want peace of mind my child, do not find fault with others, rather find your own faults. Learn to make all your own. No one is a stranger, my dear. The whole world is your own."

May Mother Durga destroy all selfishness and ignorance in our hearts and give us intense love for God. May She inspire us to serve our fellow human beings as our own selves!

Swami Kripamayananda

(Swami Kripamayananda)

বেদের প্রাসঙ্গিকতা

ড. দিলীপ চক্রবর্তী

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম ধর্মগ্রন্থ। বেদ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে যতটা বিশাল, ততটাই বিশাল আমার মতন হিন্দুদের বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। এটা লজ্জার বিষয় যে, আমরা বেদ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। তার চেয়েও বেশি লজ্জার বিষয় যে, আমরা যে জানি না, সেটাও জানি না।

সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার শ্রী বুলবুল ভৌমিক-এর "সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা" নামের একটা সুন্দর বই আমার হাতে আসে। বেদ সম্বন্ধে আমার সামান্য আগ্রহ আগেই ছিলো– এই বইটা পড়ে সেই আগ্রহ অনেকটা বেড়েছে।

বিদেশীদের উচ্চারণের ভুলে আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আসলে হিন্দুধর্ম নামে কোনো ধর্মই নেই। বেদের ওপর আশ্রিত বলে আমাদের ধর্ম 'বৈদিক ধর্ম' এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম বলে একে 'সনাতন ধর্ম'ও বলা হয়।

> আমরা ধরে নেই যে, বেদের ভাষা সংস্কৃত। এই ধারণা কিন্তু একেবারে যথার্থ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেদ একদিনে লেখা হয়নি বা একজন লেখেননি। বেদে আক্ষরিক অর্থেই "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা" প্রবাহিত।

ভারতের উত্তরে সুবিশাল হিমালয় পর্বতশ্রেণি যেটা বিশ্বের দীর্ঘতম পর্বতমালা। আর দেশের তিনদিকে সমুদ্র, কাজেই বহিরাগতদের ভারতে প্রথম আগমন মূলত উত্তর পশ্চিম দিক দিয়েই হয়েছে। প্রথম যুগে ভারতে আগত পারসীরা প্রথমেই সিন্ধু নদের সাক্ষাৎ পায়। কিন্তু ওরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করত। ফলে সিন্ধুনদ ওদের উচ্চারণে হিন্দু নদ হয়ে যায় এবং এখানকার অধিবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ব বাংলার অনেকেই 'স' কে 'হ' বলেন, এই নিয়ে সংস্কৃতে একটি মজার শ্লোক আছে–

"আশীর্বাদং ন গৃহিয়াত পূর্বদেশ নির্বাসনঃ,
যতস্তে শতায়ুরীতি বক্তব্যে হতায়ুরীতি বাদিনঃ"।

অর্থাৎ পূর্ব দেশের মানুষদের থেকে আশীর্বাদ নেওয়া উচিত না। কারণ এরা "শতায়ু হও" এটা বলতে গিয়ে বলেন 'হতায়ু হও' অর্থাৎ "মরে যাও"।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ বড় ধর্ম কোনো একা বা একাধিক প্রবক্তার নামানুসারে হয়েছে– যেমন যিশু ক্রীষ্টর অনুগামীরা খৃষ্টান, মহামতি বুদ্ধর অনুগামীরা বৌদ্ধ কিন্তু হিন্দুধর্ম সেইভাবে কোনো প্রবক্তার নামানুসারে নয়।

আমার এই প্রবন্ধের শীর্ষক– বেদের প্রাসঙ্গিকতা– অনেকের মনে হতে পারে যে, এই 'বেদের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষকটাই অপ্রাসঙ্গিক। বেদ অতীতে প্রাসঙ্গিক ছিলো, বর্তমানে প্রাসঙ্গিক আছে এবং ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবে। কারণ বেদ কোনো বিশেষ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ না, বেদ সমগ্র মানব ধর্মের আকর গ্রন্থ; বেদে মানবজীবনের কোনো খণ্ডাংশের আলোচনা নেই, মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে। আমাদের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (যাকে ইংরেজীতে বলে "from cradle to grave") মোট যে দশটি অবস্থান আছে– গর্ভাধান, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণভেদ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া– তার প্রত্যেকটা সম্বন্ধে বেদ-এ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আছে এবং উপযুক্ত মন্ত্র আছে।

বৈদিক ধর্মকে সম্যকরূপে বুঝতে হলে– আমাদের প্রথমেই ধর্মের পরিভাষা বুঝতে হবে। আমরা বিদেশী ভাষার প্রভাবে ধর্ম অর্থে Religion বুঝি। এটা একটা বিরাট ভুল, Religion শব্দ ধর্মের একটা খণ্ডাংশ মাত্র। সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম' এর অর্থ অনেক ব্যাপক, ধর্ম শব্দটা হচ্ছে "ধৃ" ধাতু+ম (মন)– যা মনকে ধারণ করে, পোষণ করে। সবার ধর্ম আছে– সকলকে তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে হয়। আমাদের প্রাণ আছে আমাদের প্রাণী ধর্ম পালন করতে হয়। আমরা জীবিত আমাদের জীব ধর্ম পালন করতে হয়। এইভাবে আগুনের ধর্ম দহন করা, জলের ধর্ম শীতলতা প্রদান করা, শিক্ষকের ধর্ম- শিক্ষাদান করা, বিদ্যার্থীর ধর্ম-বিদ্যাভ্যাস করা, এমনকি চোরেরও ধর্ম আছে– চুরি করা।

ধর্মের আসল তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে-বৈদিক ধর্মের ব্যাপক অর্থে– "Dharma, according to Indian Heritage, is the justification of one's existence in the cosmic pattern."

ধর্মের দশটি বাহ্যিক লক্ষণ– সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, চিত্ত সংযম, অচৌর্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ।

অন্য দিকে Religion শব্দটা এসেছে Latin শব্দ Religio থেকে, যার অর্থ– Regulate, Restraint অর্থাৎ মানুষকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে নির্দিষ্ট পথে চালিত করা, ধর্ম আর Religion-এর পার্থক্য বোঝাতে সাদবেরী (Sudbery) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তী প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যার সামান্য অংশ আমি নীচে তুলে দিলাম।

"Religion-এর জন্ম ঊষর অঞ্চলে, যেখানে জীবিকার জন্য সংগ্রাম বেশি, "অন্নচিন্তা চমৎকার"– সেখানে অন্য চিন্তাকে ঠেকিয়ে রাখে (অন্ন চিন্তার মাঝে অন্য চিন্তার স্থান কোথায়?)।

কিন্তু ধর্মের উদ্ভব অরণ্য অঞ্চলে, শস্য-শ্যামল অঞ্চলে, যেখানে জীবিকার জন্য সংগ্রাম কম, চিন্তার অবকাশ বেশি।"

বৈদিক ধর্ম যে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা আমরা একটা শ্লোক থেকেই বুঝতে পারি–

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত ন কর্ত্যব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে" ॥

অর্থাৎ– "কেবল শাস্ত্রে আছে বলেই তা কর্তব্য বলে নির্ণয় করা ঠিক নয়। যুক্তি বিচার না করে গতানুগতিকভাবে শাস্ত্রানুসরণ করলে ধর্মহানি হয়।"

বেদ সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য জ্ঞান তার জন্য আমি শ্রী বুলবুল ভৌমিক-এর বই ছাড়াও বেদান্ত সোসাইটির স্বামী কৃপাময়ানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী পুরস্কারানন্দ, ড. সম্প্রসাদ মজুমদার, অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তী, শ্রী প্রসাদ ব্যানার্জী, শ্রী হরিহর দে এবং বাংলাদেশের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং বর্তমানে টরেন্টো নিবাসী শ্রীমান সুব্রত কুমার দাসের কাছে ঋণী।

এটা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত আটজনের মধ্যে চারজনার বেদ এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের বিষয় ছিল না। ওনারা বেদ পড়েছেন অন্তরের তাগিদে এবং মনের আনন্দে। মহাদেববাবু, হরিহর বাবু, সম্প্রসাদ বাবু বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। সুব্রত বাবু কলা বিভাগের ছাত্র হলেও দর্শনশাস্ত্র ওনার বিষয় ছিল না।

করতে বসেছি বেদের আলোচনা, অথচ ভূমিকা লিখতেই রাত কাবার, যাক বাংলা প্রবাদে বলে "খাজনার চেয়ে বাজনা ভারী"।

বেদের রচনাকাল– হিন্দুদের ইতিহাস আছে, কিন্তু প্রামাণ্য ইতিহাস নেই, ফলে বেদের মতন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ (বলা হয় "বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্" অর্থাৎ বেদই ধর্মের মূল) কবে লেখা হয়েছে, কারা লিখেছেন, মোট মন্ত্রের সংখ্যা কত কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই। সব উত্তরই অনুমান নির্ভর। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রী অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রমুখ এবং বিদেশীদের মধ্যে জাপানের ওকাকুরা কাকাসু, আমেরিকার ব্লুমফিল্ড, ইউরোপের ম্যাক্সমুলার (ভারতীয় দর্শনের ওপর ওনার গভীর জ্ঞানের জন্য ওনাকে মজা করে অনেকে ওনার নামের ভারতীয়করণ করে ওনাকে মোক্ষমূলার বলতেন) এ. এল. বাশাম প্রমুখ। সংস্কৃত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার ইংল্যাণ্ডের আই সিস নদীর তীরে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ঐ শহরের নাম অক্সফোর্ড। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করা যায় যার ফলে ঐ শহরের নাম অক্সফোর্ড রাখা হয়। আই সিস নদী ঐ শহরের এক জায়গায় খুব অগভীর ছিল। সেখান দিয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে ষাঁড় (ox) এবং অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণী নদী পার হত, সেই স্থান যেখানে ষাঁড় অর্থাৎ ox নদী পার হত। সেই জায়গার নাম ox এর ford হিসেবে oxford রাখা হয়। নানা জ্যোতিষীর গণনা এবং অন্যান্য গণনার মাধ্যমে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে বেদের রচনা হয়েছে। এ বিষয়েও অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তীর যুক্তি আমার কাছে সারগর্ভ মনে হয়েছে। উনি বলেছেন যে, বেদ অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে কারণ সে সময় ভারতে সরস্বতী নদী যে খুবই প্রধান নদী ছিলো যেটা বোঝা যায় জলশুদ্ধির নিম্নলিখিত বিখ্যাত মন্ত্র থেকে–

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু" ॥

আর সেই পৌরাণিক সরস্বতী নদী যে ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে লুপ্ত হয়েছে, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় (অর্থাৎ কোনো মনুষ্যরচিত নয়) যদি গৌতম ঋষির পুত্র নোধা, ঋষি বশিষ্ঠ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব– এই চার ভাগে ভাগ করে ওনার চার শিষ্যকে মন্ত্রগুলোকে একত্র করার নির্দেশ দ্যান। পৈল ঋষিকে ঋগ্বেদ, জৈমিনি ঋষিকে সামবেদ, বৈশম্পায়ন ঋষিকে যজুর্বেদ এবং সুমণ্ডু ঋষিকে অথর্ব বেদ।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ একটি করে হলেও যজুর্বেদ দুইটি, শুক্ল যজুর্বেদ (শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ কারণ এটা সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞ সম্পাদনার জন্য যে মন্ত্র, তাদের সংকলন), অন্যটা কৃষ্ণ যজুর্বেদ (এটাকে কৃষ্ণ বা অপবিত্র মনে করা হয় কারণ গুরু বৈশম্পায়নের নির্দেশে ওনার অনুগত শিষ্য যাজ্ঞবল্ক তার অধীত বেদ বিদ্যা উদগীরণ করেন এবং ওনার একশত জন শিষ্যে তিতির পক্ষীর রূপ ধরে সেই বিদ্যা ধারণ করেন। অনেক ঐতিহাসিক একে বেদের গণতন্ত্রীকরণ বলে মনে করেন)।

আমরা ধরে নেই যে, বেদের ভাষা সংস্কৃত। এই ধারণা কিন্তু একেবারে যথার্থ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেদ একদিনে লেখা হয়নি বা একজন লেখেননি। বেদে আক্ষরিক অর্থেই "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা" প্রবাহিত। আমরা এত জানি যে ভাষার বিবর্তন আছে (চর্যাপদ যুগের বাংলা আর বঙ্কিমের যুগের বাংলা এক না, আবার বঙ্কিমের যুগের বাংলা আর বর্তমান কালের বাংলা এক না)।

অন্যান্য বহু পুরুষ এবং মহিলা ঋষি বেদের অনেক রচনা করেছেন তার প্রমাণ বেদের মধ্যেই রয়েছে। আসলে এই সব মুনি-ঋষিরা ভগবানের চিন্তায় এতই বিভোর ছিলেন যে, ওনারা ভগবানেই লীন হয়ে গিয়েছেন। বেদকে অপৌরুষের অর্থাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত ধরা হয় বলেই বেদকে অভ্রান্ত বলা হয়।

একইভাবে বেদে মোট কত সংখ্যক মন্ত্র আছে সেটাও অনুমান নির্ভর। অনুমান করা হয় যে, প্রথমে বেদে লক্ষাধিক মন্ত্র ছিলো, কিন্তু কালক্রমে তা হারিয়ে গিয়ে হাজার কুড়ি মতন মন্ত্র এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে। সে সময় তো লিখে রাখার প্রথা ছিলো না– শিষ্য পরম্পরায় সব মুখে মুখে শুনে মনে রাখতো। এখন পর্যন্ত বেদের যে মন্ত্রগুলো উদ্ধার হয়েছে তাদের মধ্যে ঋগ্বেদে মন্ত্র সংখ্যা ১০,৫৫২, সামবেদে ১৮৭৫, যজুর্বেদে ১৯৭৫ আর অথর্ববেদে ৫,৯৭৭, অর্থাৎ এই চার বেদের মন্ত্র সংখ্যা ২০,৩৭৯।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেদ প্রথমে ছিলো অখণ্ড, মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (ওনার গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ছিলো, তাই কৃষ্ণ, ওনার দ্বীপে জন্ম হয়েছিল, তাই দ্বৈপায়ন, উনি বেদ-এর বিভাগ বা ব্যাস করেছিলেন বলে উনি "বেদব্যাস" নামে পরিচিত)।

সেইরকম সংস্কৃত ভাষারও বিবর্তন হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন রূপকে ধরা হয় ঋক্ সংহিতার ভাষা, আর বর্তমান কালের সংস্কৃত ভাষাকে "সংস্কৃত" অর্থাৎ refined বা reformed বলা হয়। তাই অনেক ঐতিহাসিক বেদের ভাষাকে প্রাচীন ভারতীয় অভিজাত আর্য ভাষা (Ancient High India) বলেন।

বেদের চারটি ভাগ আলাদা হলেও একভাগের অনেক মন্ত্র অন্য ভাগেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র সাধারণত কোনো বস্তুর প্রাপ্তির জন্য (শস্য, গাভী, অশ্ব, বৃষ্টি, জয় বা সুন্দরী নারী– যাই হোক) ছন্দে লেখা প্রার্থনা। সামবেদ ও প্রার্থনা মন্ত্র, তবে সেগুলো সঙ্গীত প্রধান। সামন অর্থে সঙ্গীত, শুক্ল যজুর্বেদ সকাম প্রার্থনা, কৃষ্ণ যজুর্বেদ যজ্ঞের পদ্ধতি, অথর্ববেদ যাদু জাতীয় ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র।

প্রত্যেক বেদেরই আবার তিনটে করে প্রধান অংশ আছে– মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ। সংহিতা হল মন্ত্রের সংকলন আর সেটা প্রত্যেক বেদের একটা করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ প্রত্যেক বেদের একাধিক, যজ্ঞের মন্ত্রগুলোর যে ব্যাখ্যা গদ্যে দেওয়া আছে, সেগুলো ব্রাহ্মণ, ক্রমে ক্রমে এই ব্রাহ্মণ অংশের মন্ত্রসকলের জ্ঞাতারা ব্রাহ্মণ জাতি হিসেবে পরিচিত হন।

উপনিষদ হ'ল বেদের সারাংশ। বেদ যদি বৃক্ষ হয়, তবে উপনিষদ তার ফল; বেদ যদি পুষ্প হয় তবে উপনিষদ তার সুগন্ধ; বেদ যদি গাভী হয়, তবে উপনিষদ তার দুগ্ধ।

বেদ যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা আমরা এর "বেদ" নামকরণ থেকেই বুঝতে পারি। "বেদ" কথাটা এসেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে যার অর্থ বিদ্যা, জ্ঞান। এর থেকে বিদ্বান, বিদুষী, জ্ঞানী– কথাগুলো এসেছে। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার খুব মূল্য এবং বিদ্বানের খুব সম্মান ছিলো। বলা হ'ত–

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা।
বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে" ॥
এবং এও বলা হয়– "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"।

যে প্রকৃত বিদ্বান সে হবে নম্র, বিনয়ী, ভদ্র– সমাজের নৈতিকতার মেরুদণ্ড। বিদ্যার এই রকম মহত্ত্বপূর্ণ স্থানের জন্যই আমরা প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পেয়েছি সম্রাট অশোকের মতন মহান নৃপতি, চাণক্যর মতন ধীশক্তি সম্পন্ন রাজনেতা, পাণিনি, পতঞ্জলির মতন বৈয়াকরণ, চরক, শুশ্রুতের মতন চিকিৎসক, কালিদাসের মতন নাট্যকার, ভবভূতি, অশ্বঘোষ, বরাহমিহির এর মতন পণ্ডিত, প্রজ্ঞাপারমিতা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রার মত বিদুষী নারী। ❑

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥
[অ : ১৩, শ্লোক : ৩৫]

অনুবাদ ঃ যাঁহারা উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ জানেন এবং ভূতসমূহের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

[অ : ১৩, শ্লোক : ৩৫]

গীতায় সমন্বয়

শ্রী বুলবুল ভৌমিক

ভূমিকা : সনাতন ধর্মে (হিন্দুধর্ম) তেত্রিশ কোটি দেবতার উপস্থিতি রয়েছে বলে প্রচলিত ঘোষণা। যদিও বেদ-পুরাণ ঘেঁটে তেত্রিশ কোটি তো দূরের কথা কয়েক হাজার দেবতার অস্তিত্বও পাওয়া যায় না। আর "কোটি" শব্দটি যে সংখ্যা ব্যতীতও একটা গুণগত স্তর বা ধাপ নির্দেশ করে তা হিন্দুদের অনেকেই বিস্মৃত। ("তেত্রিশ কোটি দেবতা", সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১৩৬-১৪১) তদুপরি, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচারণাতো রয়েছে। আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা সেই মিথ্যা ভাষণকে সত্যের মর্যাদা দিই। বেদ নামক পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক যে আমাদের ঋষিদেরই প্রণীত যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি সে সচেতনতাটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। হিন্দুদের রয়েছে অসংখ্য উপাস্য দেবতা, অসংখ্য শাস্ত্র যা অন্য প্রচলিত ধর্মগুলির চেয়ে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। যেহেতু আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় নই, তাতে আমরা অনেকে অস্বস্তি অনুভব করি। কিন্তু যে ঈশ্বর **"সর্বশক্তিমান এবং ভক্তবৎসল"** (অবশ্য এই দু'টি কথা সব ধর্মই স্বীকার করে) তিনি যে কেন ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে অসংখ্য রূপ ধারণ করতে পারবেন না, তা আমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখি না। কেননা, অন্য ধর্মগুলি তা অনুমোদন করে না। আমরা নিজেদের ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি পাঠ বা অনুধাবনের চেষ্টা না করে অন্যধর্মের আলোকে নিজ ধর্মকে বিচার করতে চেষ্টা করি বা দেখতে চাই। এতই আমাদের অধঃপতন!

> একই ভগবানেরই বহুরূপের পূজারী, তেত্রিশ কোটি দেবতার অনুগামী হিন্দুদের অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। যা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক তা এই যে, বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা সকল মত ও পথের প্রতি সহনশীল এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু বেদেই যে অসংখ্য দেবতার উল্লেখের পাশাপাশি একই ঈশ্বরের কথা বেশ জোরের সাথেই ঘোষণা করা হয়েছে, তা হিন্দুদের অনেকেই জানেন না কেননা আমরা অনেকেই বেদের মন্ত্রগুলির সাথে পরিচিত নই। আসুন সেই **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬/২/১) (অর্থাৎ ঈশ্বর শুধু একই নন তিনি অদ্বিতীয়ও বটে) ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কিত কয়েকটি মন্ত্র বেদ থেকে চয়ন করি।

(১) **"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"** (ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৬)– এক ভগবানকেই জ্ঞানীরা বহু নামে ডাকেন।

(২) **"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"** (ঋগ্বেদ, ১০/১১৪/৫)– জ্ঞানী বিপ্রগণ সে শোভন পর্ণ-বিশিষ্ট এক সদ্ বস্তুকে বাক্যের দ্বারা বহুপ্রকারে কল্পনা করে থাকেন।

(৩) **"একং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি।"** (অথর্ববেদ, ১৩/৩/১৭, পৃঃ ৩২০)– একই জ্যোতি (ব্রহ্ম) বহুপ্রকারে প্রকাশিত হন।

তাহলে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, হিন্দুধর্মে আমরা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই কেন? আগেই উল্লেখ করেছি যে, **ভগবান সর্বশক্তিমান এবং ভক্তবৎসল**। ভক্তের ইচ্ছা পূরণের জন্যে সর্বশক্তিমান ভগবানের পক্ষে কোন রূপ পরিগ্রহ করাই অসম্ভব নয়। বেদে তার সমর্থনে আমরা নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাই।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষাণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥"
(ঋগ্বেদ, ৬/৪৭/১৮)

–সমস্ত সেবকগণের প্রতিনিধিভূত এ ইন্দ্র (বেদে ইন্দ্রই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। সীমিত শক্তির অধিকারী দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচিতি বেদের অনেক পরবর্তীতে পুরাণসমূহের সময়ের) বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সে রূপ পরিগ্রহ করে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করে যজমানগণের (ভক্তের) নিকট উপস্থিত হন। কারণ তাঁর রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রেও একই ভগবানের বিবিধ রূপের উল্লেখ আছে। ("সাকার বনাম নিরাকার উপাসনা", সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১২২-১২৮)।

অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে, ঈশ্বরের একত্ব নিয়ে এত অধিক আলোচনা গীতার সমন্বয় বিষয়বস্তুর সাথে অমিল বা অপ্রয়োজনীয়। সবিনয়ে জানিয়ে রাখি যে, এ আলোচনা গীতার সমন্বয়বাদের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পাঠক যখন হিন্দুধর্মের বহু দেবতার ধারণা থেকে এক ঈশ্বরের ধারণায় পৌঁছাতে পারবেন, তখনই তার পক্ষে গীতার সমন্বয় তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

প্রারম্ভিক আলোচনা : গীতার সমন্বয় তত্ত্ব আলোচনা করার পূর্বে হিন্দু শাস্ত্রের একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বেদ শুধু হিন্দুদেরই সর্বপ্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, সমগ্র মানব জাতিরও সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বেদের চেয়ে প্রাচীনতর কোন ধর্মগ্রন্থের পরিচয় এখন পর্যন্ত মানবজাতি আবিষ্কার করতে পারেনি। ভগবানের আরাধনা করে ঋষিদের অন্তরে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা ঋষিরা শিষ্যদের বিতরণ করে গেছেন এক অতি প্রাচীনকালে। ("বেদ–বহিরঙ্গ আলোচনা, "সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১-১১) বেদ যজ্ঞভিত্তিক, অন্য কথায় কর্মভিত্তিক। ভগবানে সমর্পণ করে কর্মকেই আমরা যজ্ঞ বলতে পারি সহজ ভাষায়। গীতায় ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য ও সখা (**"ভক্তো-অসি মে সখা।"** ৪/৩) অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন,

"যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মৎ অর্পণম্ ॥" (৯/২৭)

–হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু আহার কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর, তা সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।

তবে অনেক সমালোচক বেদের মন্ত্রগুলিকে শুধুমাত্র সকাম প্রার্থনা বলেই এক অপূর্ণ ও একদেশী আলোচনা করেন। আমরা আগেই ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ক কয়েকটি বেদমন্ত্রের উল্লেখ করেছি। সংসারের আসক্তি ও সুখভোগ ত্যাগ করে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করে ঋষিগণ যে সত্য তাঁদের অন্তরে উপলব্ধি করেছেন তা যে নিছক জাগতিক সুখ-সাচ্ছন্দ্য নয়, তা সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়াও বেদের মন্ত্রগুলির যে এক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ বা ব্যাখ্যা রয়েছে তা অনেক অসচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ("নিণ্যা বচাংসি," সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা, পৃ:-৩৩-৩৭)।

বেদের বিষয়বস্তুর যে চারটি ক্রমস্তর রয়েছে (চারটি ভাগ– ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ইত্যাদি নয়) সেগুলি হচ্ছে– সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে অনেকে **কর্মকাণ্ড** এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে **জ্ঞানকাণ্ড** বলে অভিহিত করে থাকেন। এর মধ্যে জ্ঞানালোচনার পরাকাষ্ঠা ঘটেছে উপনিষদে। উপনিষদ মূলত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আলোচনা। যদিও সাকার ভগবানের নয় বরং নিরাকার ব্রহ্মের আলোচনাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। কিন্তু সাকার ভগবান ও নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে কোন প্রভেদ তো ভক্ত বা জ্ঞানীরা দেখেন না।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১/২/১১)

–তত্ত্ববেত্তাগণ জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের অভেদ অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে থাকেন। সেই তত্ত্বকেই কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন পরমাত্মা আর কেউ বলেন ভগবান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাও একটা উপনিষদ। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে আমরা পাই **"শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু।"** বিভিন্ন উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র আলোচনা এখানে আবশ্যক।

একটি তত্ত্ব বা উপদেশ উপনিষদের প্রাণস্বরূপ বা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয় যা এই মন্ত্রে পরিস্ফুটিত হয়েছে। **"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"** (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১)– এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার এবং নির্গুণ হতে পারেন কিন্তু তিনি সর্বত্রই এবং সর্বপ্রাণীতেই অবস্থিত। কেননা, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে। **"তজ্জলানিতি।"** (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১)– ব্রহ্ম হতেই সবকিছু উৎপন্ন, ব্রহ্মেই সবকিছু লীন হয় এবং ব্রহ্মেই সবকিছু জীবিত থাকে। আর তা হতে বাধ্য। কারণ ব্রহ্ম **"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং।"** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫/১/১)– ব্রহ্ম প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত যে কোন রূপেই পূর্ণ। আর গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে উপনিষদের উপরিউক্ত মন্ত্র দু'টির মূল ভাব আরও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং, ব্রহ্ম-কর্ম-সমাধিনা ॥" (৪/২৪)

–অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম। ব্রহ্মকর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন।

ভক্ত ভগবানের কাছে যে তিনটি মার্গ বা পথের মাধ্যমে পৌঁছাতে পারেন সেগুলি হচ্ছে– কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে ভগবান উল্লেখ করেছেন,

"যোগত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রাচিৎ ॥"
(১১/২০/৬)

–আমি মানবকল্যাণ কামনায় বেদে ও অন্যত্রও অধিকার ভেদে এই যোগত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছি। যোগত্রয় হল– জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই পরম কল্যাণকর পথ ছাড়া আর অন্য পথ নাই। ভগবান আরও বলেছেন, "আমাকে প্রাপ্তির তিনটি উপায়– ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/২১/১)।

যদিও শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়েছে মহাভারতের (গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত) পরবর্তীতে, আমরা ভগবান উপদিষ্ট তিনটি মার্গের সম্পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তীতে গীতায় সমন্বয়বাদ আলোচনা ও অনুধাবনের সহায়ক বিধায় গীতার পূর্বেই শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ে সামান্য আলোকপাত করব। ভক্তি ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথমবারের মত ভক্তির উল্লেখ লক্ষ্য করি।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিয়া হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ, প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" (৬/২৩)

–যাঁর পরমেশ্বরে অকৃত্রিম ভক্তি আছে এবং তদনুরূপ ভক্তি গুরুদেবেও আছে, উপনিষদ-কথিত এসকল তত্ত্বজ্ঞান সেরূপ মহাত্মার নিকটেই প্রকাশিত হয়।

কিন্তু ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেমে। গোপীদের তনু-মন, মান-সম্মান, জীবন-মৃত্যু সবই শ্রীকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে ভগবান নন, কিন্তু সর্বস্ব। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাঁদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়, অদর্শনে বিরহে প্রাণ যায় যায়। বিরহের তপ্ত অনলে দেহ-মন যখন দুঃখে জর্জরিত, তখন শ্রীকৃষ্ণের কিছু কথা, কিছু স্মৃতি গোপীদের প্রাণকে রক্ষা করে।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০/৩১/৯)

–ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবনে তোমার কথা অমৃত স্বরূপ, ক্রান্তিদর্শী কবিগণ কর্তৃক প্রশংসিত, পাপহারক।

শ্রবণ মাত্রই মঙ্গলকারী তোমার এই অমৃত কথা যে মহাত্মারা সর্বসাধারণের মাঝে অকাতরে বিতরণ করেন, তাঁরাই এই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম এত গভীর ও ব্যাপক যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন যে, তিনি সে প্রেমের প্রতিদান দিতে অপারগ। (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০/৩২/২২) প্রেমের প্লাবনে ভক্তি ও ভালবাসা একাকার, অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। সমরূপ উপদেশ দিয়েছেন ভক্ত উদ্ধবকে শ্রীমদ্ভাগবতে। ("উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ– গীতোপদেশের প্রতিফলন," সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৬৪/৭০)।

গীতায় সমন্বয়সাধন : গীতার বিষয়বস্তুতে প্রবেশের পূর্বে আমরা "গীতা" শব্দের অর্থ সুনিশ্চিত করা আবশ্যক মনে করি। "**গীতা**" শব্দটির উৎপত্তি "**গৈ**" ধাতু থেকে যার অর্থ বাক্য বা বচন। [গৈ– > গীঃ (গির্)] (বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ: ৭৯৫)। গীতায় আমরা প্রায়শই পাই "**শ্রীভগবান্ উবাচ**" অর্থাৎ শ্রীভগবানের বচন। প্রদত্ত উপদেশকেই গীতা বলা হয়। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের গীতা লক্ষিত হয়। যেমন, পরাশর গীতা অর্থাৎ পরাশর মুনি কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ, হংস গীতা অর্থাৎ হংসরূপী ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ, যমগীতা অর্থাৎ যমরাজ কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ ইত্যাদি। (গীতা সংগ্রহ) শ্রীভগবান কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলীকে বলা হয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথবা সংক্ষেপে গীতা। গীতা বললে হিন্দুরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই নির্দেশ করে।

একই ভগবানেরই বহুরূপের পূজারী, তেত্রিশ কোটি দেবতার অনুগামী হিন্দুদের অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। যা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক তা এই যে, বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা সকল মত ও পথের প্রতি সহনশীল এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধাশীল। তার কারণ আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা। এ শিক্ষা গীতাতেও বর্তমান। "হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত, মুনি-ঋষিও অনন্ত, কিন্তু আমাদের আয়ু অতি অল্প; সর্বদা সাংসারিক কার্যের ঝঞ্ঝাট, সুতরাং একজনের জীবনে সমস্ত শাস্ত্র অধীত হওয়া এবং প্রকৃত ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খিঁচুড়ী না পাকাইয়া, সব জাতির আদরণীয়, মানব-জীবনের উপদেষ্টা একমাত্র ধর্মজ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করা কর্তব্য।" (যোগীগুরু, পৃ: ৮১)। স্বামী শঙ্করাচার্য বলেন, "**গীতাশাস্ত্রং সমস্ত-বেদার্থ-সারসংগ্রহভূতং।**" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- শাঙ্করভাষ্য, উপোদঘাত ভাষ্য/১১, পৃ: ১০) গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার সংগ্রহ-স্বরূপ। গীতার মঙ্গলাচরণ বা গীতা ধ্যানেও উল্লেখ আছে,

"সর্ব-উপনিষদো গাবো, দোগ্ধা গোপাল-নন্দন।
পার্থো বৎস সুধীঃ-ভোক্তা, দুগ্ধং গীতা-অমৃতং মহৎ ॥"
(মঙ্গলাচরণ-৫)

–সমস্ত উপনিষদ গাভীস্বরূপ, পার্থ হচ্ছেন বৎস, আর ভগবান গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই উপনিষদরূপ গাভী হতে গীতামৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করছেন। সুধী ব্যক্তিগণ এই গীতামৃতরূপ মহান দুগ্ধ আস্বাদ করেন।

গীতায় যে সর্বশাস্ত্রের সারাংশ লব্ধ হওয়া যায়, তার একটি প্রমাণ আমরা আত্মতত্ত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই সাক্ষাৎ করতে পারব। অর্জুনকে বিষাদ থেকে উদ্ধার করার অভিপ্রায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ দেহ এবং আত্মা যে দু'টি পৃথক সত্তা এবং দেহের ধ্বংস হলেও আত্মা যে চিরকাল বর্তমান থাকে অর্থাৎ আত্মাকে ধ্বংস করা যায় না তা উপদেশ করেছেন। (গীতা, ২/১১-৩০) কঠ উপনিষদে প্রায় একই রকম উপদেশ প্রদান করেন যমরাজ নচিকেতাকে তাঁর তৃতীয় বর প্রার্থনার উত্তরে। (কঠ উপনিষদ, ১ম অধ্যায়/ ২য় বল্লী - ৩য় বল্লী) শুধু তা-ই নয়, গীতার ২/১৯ শ্লোক এবং কঠ উপনিষদের ১/২/১৯ শ্লোকটি আক্ষরিক অর্থেই প্রায় একই রকম। একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩৫ম সূক্তেও আমরা যম-নচিকেতা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করি।

আমরা ভূমিকা এবং প্রারম্ভিক আলোচনায়ও গীতার সাথে বেদ (**কর্মকাণ্ড**), উপনিষদ (**জ্ঞানকাণ্ড**) এবং শ্রীমদ্ভাগবত (**ভক্তিকাণ্ড**)–এর আলোচনার এক সামঞ্জস্য ও বক্তব্যের মতৈক্য লক্ষ্য করেছি। গীতার আঠারটি অধ্যায়কেও অনেক ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সমরূপ তিনটি মার্গভিত্তিক ভাগ করেন। গীতার প্রথম অধ্যায় (অর্জুন-বিষাদ-যোগ) থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় (ধ্যান বা অভ্যাস-যোগ) পর্যন্ত প্রথম ছয়টি অধ্যায়কে **কর্মকাণ্ড**, সপ্তম অধ্যায় (জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ) থেকে দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তিযোগ) পর্যন্ত মধ্যবর্তী ছয়টি অধ্যায়কে **ভক্তিকাণ্ড** এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ) থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষযোগ) পর্যন্ত সর্বশেষ ছয়টি অধ্যায়কে **জ্ঞানকাণ্ড** বলে অভিহিত করেন।

গীতার অনেক ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ব্যাখ্যা বা টীকা হচ্ছে গীতার শ্লোকগুলির সরলার্থ। "ভাষ্যকে সঠিক শব্দার্থ-ব্যাখ্যা বলা যায় না; মূলগ্রন্থ-অবলম্বনে একটি দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য–শুধু শব্দার্থ-প্রকাশ নয়। একটি দর্শন-স্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন, পৃঃ ২৬৭, টীকা-১) স্বামী শঙ্করাচার্য জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, বাল গঙ্গাধর তিলক কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা কল্পতরু বিশেষ। "**যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু।**" (কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১/২) গীতা এমন অমৃতদায়িনী পুস্তক যে, যে যা চায় সে-ই তা পায়। গীতা কাউকে রিক্ত হস্তে ফেরায় না। তবে এ কথা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে,

"বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করিবার জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। তৎকালপ্রচলিত সমস্ত মতবাদের উদার সমন্বয় গীতার ভিতরে দেখা যায় এবং এই সমন্বয়ের সাহায্যে গীতা যে চিরন্তন সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছে– তাহার প্রমাণ শুধু যুক্তিতর্ক নহে।... গীতার ভাষা, গীতার চিন্তার ধারা, গীতার ভাবপ্রকাশের রীতি-পদ্ধতি এরূপ যে কোন বিশেষ মতবাদের ভিতর গীতা সীমাবদ্ধ নহে, কোন মতবাদকে গীতা সম্পূর্ণ বর্জন করে না।... ইহার ভিতর সকল মতবাদের অপূর্ব সমন্বয় আছে এবং এমন তথ্যের সন্ধান আছে যাহার সাহায্যে সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে।" (গীতা-নিবন্ধ, পৃ: ৬-৭)

এক্ষণে আমরা প্রয়াস করব গীতায় কোন বিশেষ মার্গের (কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান) শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের কোন প্রচেষ্টা করা হয়েছে কী-না। তদুপরি অন্বেষণ করব এক মার্গের সাথে অন্য মার্গের কোন পৃথকত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বীকৃত হয়েছে কী-না। এই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সংশয় ও প্রশ্ন শুধুমাত্র আমাদের মনেই অঙ্কুরিত হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখোমুখি হয়ে উপদেশ গ্রহণকালে অর্জুনের মুখেও উচ্চারিত হয়েছিল। তা-ই স্বাভাবিক। কেননা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদানকালে কখনও জ্ঞানের প্রশংসা, কখনও কর্মের প্রশংসা আবার কখনও ভক্তির প্রশংসা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ঃ

জ্ঞানের প্রশংসা :

১) জ্ঞানী পুরুষগণ কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে পরমপদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (২/৪৯)

২) জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মরাশিকে ভস্ম করে। (৪/৩৭)

৩) ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নাই। (৪/৩৮)

কর্মের প্রশংসা :

১) স্বধর্মে নিয়োজিত থেকে কর্ম করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। (২/৩১-৩৮)

২) নিষ্কাম কর্মযোগের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। (২/৩৯-৫০)

৩) নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না। (৪/৪১)

ভক্তির প্রশংসা :

১) ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত ভক্তের যে কোন উপহার (পত্র, পুষ্প, ফল, জল) আমি গ্রহণ করি। (৯/২৬)

২) আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না। (৯/৩১)

৩) আমার ভক্ত হও। (৯/৩৪, ১৮/৬৫)

তাই দেখি তৃতীয় অধ্যায়ের (কর্মযোগ) ১ম এবং ২য় শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "বিভ্রান্তিকর উত্তর না দিয়ে সুনিশ্চিতভাবে আমায় বল কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।" একই রকম প্রশ্নের অবতারণা পরিলক্ষিত হয় পঞ্চম অধ্যায়ের (সন্ন্যাসযোগ) ১ম শ্লোকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথোপযুক্ত উত্তর দিলেন, "জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং কর্মীদের জন্য কর্মযোগ।" (৩/৩) অর্থাৎ আধারভেদে মার্গ চয়ন ও অনুসরণ। যার মধ্যে জ্ঞানের ভাব প্রবল তার জন্য জ্ঞানযোগ এবং যার মধ্যে কর্মস্পৃহা প্রবল তার জন্য কর্মযোগ প্রশস্ত। যার মধ্যে যে ভাব বা গুণাবলী বর্তমান সে অনুসারে তার পথ অনুসরণ করা শ্রেয়। কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করলেই ময়ূর হওয়া যায় না। কেননা, সহজাত প্রবৃত্তি ["**স্বভাবজেন**" (গীতা, ১৮/৬০)] বা যোগ্যতা অনুসরণ না করে অন্য পথ অনুসরণ করা বিপদজনক। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি দু'বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। (৩/৩৫, ১৮/৪৭) পরম ভক্ত উদ্ধবকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্ম ও তার ফলে বৈরাগ্যযুক্ত বা তা পরিত্যাগী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর যাদের কর্ম ও তার ফলে বিরক্তি আসেনি বা তার ফল যে দুঃখ হবে সে ধারণা জন্মায়নি সেই সকাম ব্যক্তিগণ কর্মযোগের অধিকারী। যে ব্যক্তি চরম বিরক্ত ও চরম আসক্ত দুইই নয় এবং যার পূর্বজন্মকৃত কর্মফলে সৌভাগ্যবশত আমার লীলা কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছে সেই প্রকৃত ভক্তিযোগের অধিকারী। (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/২০/৭-৮)

আর গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকটি শুধুমাত্র যে গীতার সমন্বয়ের সারকথা ব্যক্ত করেছে তা নয়, পৃথিবীর সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের সহাবস্থানের উপায় নির্দেশ করেছে ঃ

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তান্-তথৈব ভজামি-অহম্।
মম বর্ত্ম-অনুবর্তন্তে, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥" (৪/১১)

–যে যেভাবেই আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। যে যে পথই অনুসরণ করুক, শেষ পর্যন্ত মানুষ আমাতেই পৌঁছায়।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে– "এই শ্লোকের তাৎপর্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না;– হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক– যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। একমাত্র সর্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম। ইহাও প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই– আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্য আর নাই।" (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা– বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ: ৭৭০)

গীতার উপদেশের মূল লক্ষ্য হল প্রত্যেকে যেন একজন সৎ-সহজ-সরল অর্থাৎ এক কথায় ভাল মানুষে পরিবর্তিত হয়। কারণ একজন ভাল মানুষ (জীবাত্মা) আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে তার উৎস পরমাত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম হবে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে ভগবান বিভিন্নভাবে একজন ব্যক্তির ভক্ত বা ভাল মানুষ হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন।

২য় অধ্যায় => সাংখ্য যোগ => স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২/৫৬-৬১)
৪র্থ অধ্যায় = জ্ঞান যোগ => জ্ঞানীর লক্ষণ (৪/১৯-২৩)
৫ম অধ্যায় => সন্ন্যাস যোগ => সমদর্শী মহাত্মাগণের লক্ষণ (৫/২০-২৬)

৬ষ্ঠ অধ্যায় => অভ্যাস যোগ => যোগীর লক্ষণ (৬/৭-৯)
১২শ অধ্যায় => ভক্তি যোগ => ভক্তের লক্ষণ (১২/১৩-২০)
১৩শ অধ্যায় => ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ = জ্ঞানের লক্ষণ (১৩/৭-১১)
১৪শ অধ্যায় => গুণত্রয়বিভাগ যোগ = ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ (১৪/২২-২৬)
১৬শ অধ্যায় দৈবী সম্পদের লক্ষণ (১৬/১-৩)

"গীতায় আদর্শ কর্মী, আদর্শ জ্ঞানী ও আদর্শ ভক্তের উপযোগী যে সমস্ত লক্ষণসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে সূচিত হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য অতি কম। এতেই বোঝা যায়, গীতা সমন্বয়মূলক মহাগ্রন্থ।" (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা– স্বামী অদ্বৈতানন্দ, পৃঃ ১৬৯)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ নিজস্ব আধার বা যোগ্যতা অনুসারে গীতায় বর্ণিত তিনটি মার্গের (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ) যে কোন একটি অবলম্বন করে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। তিনটি মার্গই পরস্পরের পরিপূরক এবং পরিপোষক। যেমন শঙ্করাচার্য জ্ঞানমার্গের সাধক হয়েও সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে বহু পুস্তক রচনা করেছেন, মঠ স্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত ভক্তি-সংশ্লিষ্ট স্তোত্রগুলি তাঁর ভক্তহৃদয়ের পরিচায়ক। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অন্তরে ছিলেন জ্ঞানী, বাইরে পরম ভক্ত। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাইরে ছিলেন জ্ঞানী, আর তাঁর ভিতরে ছিল ভক্তির প্রবাহ।

সীমিত পরিসরে সমন্বয় : একটা সাবধানবাণী আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমরা আমাদের সহজাত গুণাবলী বা যোগ্যতা অনুসারে যে পথই অনুসরণ করি না কেন, অন্য পথগুলিও মোক্ষলাভের সহায়ক, সুতরাং শ্রদ্ধেয়। নিজ পথকে মহৎ বা শ্রেষ্ঠ দেখাতে গিয়ে অন্য পথের নিন্দাবাদ করা বা উপেক্ষা করা গীতার শিক্ষার প্রতিকূল বা বিপরীত। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভগবান পূর্ণ, তাই তাঁর উপদেশাবলীও আমাদের আংশিক বা একদেশী হিসাবে গ্রহণ না করে পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের "**মহতী বিনষ্টি।**" (কেন উপনিষদ, ২/৫; বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/১৪)- মহা ধ্বংস।

বৃহত্তর পরিসরে সমন্বয় : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু হানাহানি নাই একথাও সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু কোন কোন ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের মধ্যকার মতভেদ শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তা শুধুমাত্র মতান্তরেই সীমিত নয়। পরন্তু, সমগ্র বিশ্বে এক সর্বজনীন হত্যা-উন্মাদনায় রূপ নিয়েছে। তাই একথা বলা অসঙ্গত বা অসত্য ভাষণ হবে না যে, বর্তমান পৃথিবীতে যে অশান্তি তার মূল কারণ অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রচণ্ড অভাব। "যেসব লোকের জ্ঞানের গভীরতা বড় অধিক নহে তাঁহারা ভাবেন একমাত্র তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থেই ভগবানের পরম বাক্য নিহিত আছে, আর সব জুয়াচুরি বা ভ্রান্ত।" (গীতা-নিবন্ধ, পৃঃ ৩) শুধু হিন্দুদেরকেই নয়, সমগ্র মানবজাতিকেই "ভবিষ্যৎ বিরাট সমন্বয়ের জন্য গীতাকেই ভিত্তি করিতে হইবে– গীতা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।" (গীতা-নিবন্ধ, পৃঃ ৭) অন্যথায় পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য, কেননা গীতার পরিবর্তে পারমাণবিক অস্ত্র সমগ্র মানবজাতিকে পৃথিবীর বক্ষ হতে নিশ্চিহ্ন করে দিবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। গীতার সমন্বয়ের বাণী সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুক– ভগবানের নিকট তা-ই আমাদের সবার প্রার্থনা। ❑

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১) "তেত্রিশ কোটি দেবতা।" **সনাতন ধর্ম জিজ্ঞাসা**– শ্রী বুলবুল ভৌমিক, সুফলা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ)

২) **ঋগ্বেদ-সংহিতা**– রমেশচন্দ্রের অনুবাদ অবলম্বনে, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২০১০ খ্রীষ্টাব্দ)

৩) **অথর্ববেদ-সংহিতা**– অনুবাদ ও সম্পাদনা : শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ (২০০০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪) **উপনিষদ** (অখণ্ড সংস্করণ)– অনুবাদ ও সম্পাদনা : অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ

৫) **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা** (পদচ্ছেদে)– সম্পাদনা : শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ পুরী মহারাজ, শ্রীশ্রী অদ্বৈতানন্দ ঋষিমঠ ও মিশন, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা** (সুবৃহৎ সংস্করণ)– সম্পাদনা : জগদীশচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ

৭) ব্যাসদেব বিরচিত **শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ**– গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ

৮) **বঙ্গীয় শব্দকোষ**– হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দ

৯) **গীতা সংগ্রহ** (৩৫টি গীতা একখণ্ডে) - সংকলন ও ভাষান্তর : চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, গ্রন্থিক সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

১০) **যোগীগুরু**– শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালি সহর, উঃ ২৪ পরগণা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

১১) **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা- শাঙ্করভাষ্য**– ব্যাখ্যা ও অনুবাদ : স্বামী বাসুদেবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (২০১০ খ্রীষ্টাব্দ)

১২) **স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সঙ্কলন**– রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

১৩) **কৃত্তিবাসী রামায়ণ**– গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ

১৪) **গীতা-নিবন্ধ**– শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ

১৫) **বঙ্কিম রচনাবলী**– (২য়ঃ খণ্ড), তুলি-কলম, কলকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা**– ব্যাখ্যাতা : স্বামী অদ্বৈতানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

নিউ ইয়র্ক, ফেব্রুয়ারী ৪, ২০১৭ - ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০১৭

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥
[অ : ১৮, শ্লোক : ২০]

অনুবাদ ঃ যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত অক্ষর আত্মবস্তু দৃষ্ট হন, সেই অদ্বৈত আত্মদর্শনরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে।
[অ : ১৮, শ্লোক : ২০]

চণ্ডীচিন্তা

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী

তন্ত্রের মহাশক্তি এক, অদ্বিতীয় ও চৈতন্যরূপিণী। ইহাই চরম নহে। চৈতন্যময়ী দেবীর স্বরূপে অসীম-করুণা নিহিত। করুণারূপ মহাসম্পদের খবর তাঁহার কৃপাতেই কেবল জানা যায়। বাহ্য-আচরণের কাঠিন্যের মধ্যেও মহাকরুণাই লুক্কায়িত 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।' যুদ্ধে অসুর-নিধনরূপ কার্য দ্বারা তাঁহার অপরিসীম-করুণার পরিমাপ হয় না। করুণার স্বরূপ প্রকাশ করাও অসম্ভব। তন্ত্রবিজ্ঞান বলিয়াছেন– ইনি মাতৃরূপা। বিশ্বের সর্বত্র এই মাতৃত্ব বিদ্যমান। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' সকল মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-করুণা একত্র করিলেও দেবী মহামায়ার মাতৃত্বের সমান হয় না।

সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক-মতবাদ এই যে, আমাদের সূর্য হইতে বৃহত্তর এক সূর্য কোন অজানা কারণে ইহার নিকট দিয়া বেগে চলিয়া যায়। সেই বৃহত্তর সূর্যের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সূর্যের অঙ্গহানি ঘটে। নয়টি অংশ ছুটিয়া বাহির হয় ইহার দেহ হইতে। কিন্তু এই অংশ বা গ্রহগুলি একেবারে হারাইয়া যায় নাই। সূর্য হইতে বাহির হইয়া এক-একটি নির্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া ইহারা সূর্যকেই পরিক্রমা করিতেছে। সূর্য যেমন গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, হারাইয়া যাইতে দেয় নাই, এই বিশ্বও মহামায়া হইতে আসিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে স্থিত আছে। আমরা না বুঝিলেও মাতৃবৎ করুণা যে আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে ও ধ্বংস হইতে দেয় নাই, ইহা তন্ত্রের কল্যাণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুত করুণা দেখা যায় না, হৃদয়বৃত্তির সম্প্রসারণে তার অনুভবই হয়। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের মাথা আছে, হৃদয় নাই। তন্ত্রবিজ্ঞানের মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়াবেগ যুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু জড়বিজ্ঞান যাহা দেখিতে অসমর্থ, তাহা তন্ত্র-বিজ্ঞান দেখিতে পাইয়াছে। তন্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যাহা সর্বভূতে বিরাজমান, তাঁহাকে অধীন করিয়া ভোগ করিতে গেলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। সেই শক্তিরূপা দেবীকে জানিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পূজা করিলে, তাঁহার কৃপাতেই বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত আছে, রূপলাবণ্যবতী মাতৃদেবীর মহাশক্তির কথা শুনিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাকে বিবাহ অর্থাৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শক্তি ভোগের বস্তু নহে। তিনি মাতৃরূপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পূজ্যা। মায়ের আরাধনাতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির দ্বারা সাধক শান্তির অধিকারী হন। পক্ষান্তরে সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হইলে ও শক্তিরূপিণী মাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে ফল শুভ হয় না। তন্ত্রমতে ইহা আসুরিক প্রয়াস। রাবণ দেবশক্তিকে জয় করিয়া উহা নিজ সুখভোগে নিয়োজিত করেন। ইন্দ্র বায়ু অগ্নি বরুণ প্রমুখ রাবণের আজ্ঞাবহ দাসের মত সেবা করিতেন। কিন্তু আড়ালে তাঁহারা রাবণের বিনাশের জন্য সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অভিলাষ পূরণ করেন। মানবসভ্যতা যখন কেবল ভোগ-উকরণের সমৃদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখপরায়ণ হইয়া উঠে এবং আধ্যাত্মিক নীতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদান সকল পদদলিত করিয়া চলে, তখন সেই আসুরিক সভ্যতা যে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না।

মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। যুক্ততা নষ্ট হইলে আসে দুঃখ ও অশান্তি। জীবনে দুঃখ আসিলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-জীবন মায়ের নিকট হইতে বিযুক্ত, শক্তিহীন হইয়াছে।

মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। যুক্ততা নষ্ট হইলে আসে দুঃখ ও অশান্তি। জীবনে দুঃখ আসিলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-জীবন মায়ের নিকট হইতে বিযুক্ত, শক্তিহীন হইয়াছে। তন্ত্রমতে মহাশক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপনের উপায় পূজা। ❑

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
[অ : ১৬, শ্লোক : ২১]

অনুবাদ ঃ কাম, ক্রোধ এবং লোভ – এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। ইহারা জীবের অধোগতিদায়ক। অতএব এই তিনটি বিষবৎ ত্যাগ করা উচিত।
[অ : ১৬, শ্লোক : ২১]

শালগ্রাম ও ভগবান শ্রীবিষ্ণু

অন্তরা রায়চৌধুরী

ভগবান শিবের যেমন লিঙ্গমূর্তি রয়েছে, তেমনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুরও প্রতীক হল শালগ্রাম শিলা। তিনি পালনকর্তা। হিন্দু শাস্ত্রমতে সকল পূজার ক্ষেত্রেই শালগ্রাম শিলাকে পূজা করা বিধেয়। ভগবান শিব যেমন একটুখানি জল আর বিল্বপত্রেই সন্তুষ্ট থাকেন, তেমনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হন তুলসীপত্রে। ভক্তির আলাপনে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণু পূজিত হন এই শালগ্রাম শিলার মধ্য দিয়ে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রমতে শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য অনেক।

কিন্তু এই শালগ্রাম শিলার এক বিশেষত্ব রয়েছে। যেখানে, সেখানে এ শিলা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। এর পিছনেও রয়েছে একটি চমকপ্রদ পৌরাণিক কাহিনী।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সেই পৌরাণিক ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই শিলাময় অবস্থিতির পিছনে রয়েছে তুলসী ও শঙ্খচূড়ের কাহিনী। একসময় বৃন্দাবনের গোপীকা ছিলেন তুলসী। তিনি একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিহাররত ছিলেন, এবং সেই সময় রাধিকা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রিয়তম রাধামাধবকে তুলসীর সঙ্গে দেখেই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তখন তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তুলসীর উপর এবং সেই মুহূর্তেই তিনি তুলসীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'আমার অভিসম্পাতে তুমি মর্তে'র মানবী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।' ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দেবী ভাগবত অনুযায়ী রাধিকার শাপেই তুলসী মর্তে ধর্মধ্বজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের কিছুকাল পরেই তিনি বদ্রীকাশ্রমে লক্ষ বছর ধরে তপস্যায় মগ্ন হন। তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পতি হিসেবে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে তাঁকে মন্ত্র প্রদান করেন এবং তিনি বলেন যে, সেই মন্ত্রে তাঁর রাধিকা ভীতি দূর হবে এবং শঙ্খচূড়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে ও পরবর্তীকালে তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে গোলোকে অবস্থান করবার অধিকারী হবেন। শ্রীরাধিকার শাপেই তুলসীর মত কৃষ্ণসখা সুদামাও শঙ্খচূড় দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একসময় ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় তুলসীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

> নেপালের গণ্ডকী নদীতে আজও শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। বজ্রকীট এই শিলায় চক্র রচনা করে। গঠন অনুযায়ী উনিশ রকমের শালগ্রামশিলা দেখা যায়।

দানব শঙ্খচূড় ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তিনি তাঁর পরাক্রমের হেতু ধীরে ধীরে দেবতাদের ভীতির কারণ ওয়ে ওঠেন। তাঁর অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ট হয়ে ওঠে। তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে সকল কথা জানালে ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হলেন। তপস্যা করে শঙ্খচূড় বরলাভ করেছিলেন যে তাঁর কাছে কবচ এবং তদীয় পত্নী তুলসী যতক্ষণ সতী থাকবেন ততক্ষণ জগতে কেউ তাঁকে বধ করতে সমর্থ হবেন না। ঐ কারণ ব্যতিরেকে একমাত্র ভগবান শিবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ত্রিশূল দ্বারা তাঁকে বধ করতে পারেন।

এরপর ভগবান শিবের সঙ্গে এবং দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের প্রবল সংগ্রাম বেধে গেল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই যুদ্ধের মধ্যেই একদিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শঙ্খচূড়ের কাছে কবচ ভিক্ষা করলে তিনি নিজের বিপদ জেনেও তাঁকে সেটি প্রদান করেন। নারায়ণ তাঁর ত্রিশূলটি ভগবান শিবকে ইতোমধ্যেই প্রদান করেছিলেন। শঙ্খচূড়ের সঙ্গে শিব যখন যুদ্ধরত, সেই সময় শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে নারায়ণ স্বয়ং শঙ্খচূড়ের পত্নী তুলসীকে সম্ভোগ করেন। তুলসীর সতীত্ব নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবের ত্রিশূলাঘাতে দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হয়। তুলসী তখন বিষ্ণুকে চিনতে পারেন এবং তাঁকে ছলনা করে উপভোগ করবার জন্য অভিশাপ দিয়ে বলেন, যেহেতু ছলনার দ্বারা আমার সতীত্ব হরণ করে, ধর্ম ভঙ্গ করে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছো, তুমি পাষাণের মত হৃদয়হীন, অতএব তুমি এখন পাষাণরূপী হও।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু তখন তুলসীকে বর প্রদান করে বলেন, আজ থেকে তোমার দেহ হবে গণ্ডকী নদী আর সেই দেহ থেকেই তুলসী গাছ জন্মাবে। আমিই গণ্ডকী নদীতে বজ্রকীট হয়ে শিলা কেটে তারমধ্যে শিলারূপে সর্বদা বিরাজ করব। আর এই তুলসীপত্রই হবে এই পবিত্র শিলাপূজার একমাত্র উপকরণ যা আমাকে সদাই সন্তুষ্ট করবে। তুলসী এরপর দেহত্যাগ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে গোলোকে চলে গেলেন। প্রসঙ্গত নেপালের গণ্ডকী নদীতে আজও শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। বজ্রকীট এই শিলায়চক্র রচনা করে। গঠন অনুযায়ী উনিশ রকমের শালগ্রাম শিলা দেখা যায়। ❑

অকাল-বোধন

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিল্ব-শাখায় দেবীর বোধন শারদীয়া দুর্গাপূজার একটি অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ। এই বোধনকে অকাল-বোধন বলা হয়। এখন জানতে হবে বোধন কি এবং এই বোধনকে অকাল-বোধনই বা বলা হয় কেন। বোধন অর্থাৎ জাগরণ। দেবী যেন নিদ্রিতা, পূজার জন্য তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো। স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। মা জগজ্জননী 'চৈতন্যস্বরূপিনী', তাঁর বোধেই সব বোধ, তাঁর চৈতন্যেই সব চৈতন্যময়, কাজেই তিনি নিদ্রিতা হবেন কিরূপে? আর নিদ্রিতা যদি না-ই হন, তাহলে তাঁকে জাগাবার প্রশ্নই আসে না। বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, "আমাদের যখন যে বস্তুর বা গুণের অভাব বোধ হয়, পূর্ণস্বরূপা চৈতন্যময়ী মায়ে তখন সে বস্তু বা গুণের অভাব কল্পনা করিয়া আরোপের সাহায্যে তাঁহার যথার্থ স্বরূপের উদ্বোধন করিবার প্রয়াস পাইতে হয়। এইরূপ কৌশলের ফলে কার্যত আমাদেরই সকল অভাব দূরীভূত হয়।

আমি সুপ্ত আমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে কেবল জড়ত্বের ঘনীভূত বিকাশ; ঐ অবস্থা হইতে চৈতন্যরাজ্যে উপনীত হইতে হইলে আমাকে জাগ্রত হইতে হইবে। আমি তখন সরল প্রাণে মাকেই নিদ্রিতা বলিয়া বুঝিলাম। আমি সুপ্ত, সুতরাং মাও যেন সুপ্তাই রহিয়াছেন। মা যদি জাগিতেন, তবে সন্তানও নিশ্চয়ই জাগিত। অতএব যে কোনও উপায়েই হউক, মাকে জাগাতেই হইতে 'মা তুমি জাগ, মা তুমি উদ্বুদ্ধা হও' এইরূপ বলিয়া আমরা তখন কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এইরূপ প্রার্থনার ফলে দেখিতে পাই কার্যত আমাদেরই সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়, আমরাই জাগ্রত হইয়া উঠি।"

এবার আমরা আবার অকাল-বোধন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রসিদ্ধি আছে, রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র দেবীর কৃপা লাভ করবার উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। আমাদের ছ-মাসের দেবতাদের একদিন এবং ছ-মাসে তাঁদের এক রাত।

এবার আমরা আবার অকাল-বোধন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রসিদ্ধি আছে, রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র দেবীর কৃপা লাভ করবার উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। আমাদের ছ-মাসে দেবতাদের একদিন এবং ছ-মাসে তাঁদের এক রাত। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ছ-মাসকে উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত ছ-মাসকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়ণের সময় দেবতারা থাকেন জাগ্রত; অপরপক্ষে, দক্ষিণায়নের সময় তাঁরা থাকেন নিদ্রিত। শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। দেবতারা তখন নিদ্রিত। তাই ঐ সময় তাঁদের পূজা করতে হলে প্রথমে তাঁদের জাগাতে হবে। সেজন্য রামচন্দ্র দেবীর বোধন করলেন। তাঁকে জাগরিতা করে তাঁর পূজা করলেন।

কৃত্তিবাসী-রামায়ণে রামচন্দ্রের শরৎকালীন এই পূজার বিশদ বিবরণ আছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে এই পূজার কোনও উল্লেখ নেই। তাছাড়াও যেসব পুরাণে এই পূজার উল্লেখ আছে, সেসব পুরাণের মতেও দেবীর বোধন বা পূজা কোনটাই রামচন্দ্র নিজে করেননি, করেছিলেন ব্রহ্মা। দেবী-ভাগবতে বোধনের কোনও উল্লেখ নেই, দেবর্ষি নারদের পৌরোহিত্যে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রতের উদ্‌যাপন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তবে 'ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা' ॥ হে দেবি! রাবণ-বধের উদ্দেশ্যে এবং রামচন্দ্রকে অনুগৃহীত করবার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা অকালে তোমার বোধন করেছিলেন ইত্যাদি বোধনের মন্ত্রে পূজায় ব্রহ্মার ব্রতী হওয়ার কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। সে যাই হোক, দেবীকে অসময়ে জাগিয়ে পূজা করতে হয়েছিল বলে এই বোধনকে অকালবোধন এবং এই পূজাকে অকাল-পূজা বলা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুরথ-সমাধি দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করেছিলেন বসন্তকালে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে : রাজা সুরথ চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধিমতে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চনা করেছিলেন। বসন্তকাল পড়ে উত্তরায়ণের মধ্যে। দেবতারা সে-সময়ে জাগ্রতই থাকেন। তাই বাসন্তী পূজায় বোধনের প্রয়োজন হয় না। তবে রামচন্দ্রের শরৎকালীন পূজা অকাল-পূজা হলেও কালক্রমে এই পূজাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাণে এই পূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। লঙ্কার যুদ্ধে অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে রামচন্দ্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় দেবতারা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মঙ্গল বিধানার্থে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করবেন ঠিক করলেন।

এ-বিষয়ে পরামর্শের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা পদ্মযোনি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের কাছ থেকে সব শুনে ব্রহ্মা তাঁদের দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করতে পরামর্শ দিলেন। বললেন, দেবীকে প্রসন্ন করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। একমাত্র তাঁর কৃপাতেই রামচন্দ্রের পক্ষে রাবণকে বধ করা সম্ভব। শুধু তাই নয়। রামচন্দ্রের মঙ্গলবিধানার্থ ব্রহ্মা স্বয়ং এই পূজায় ব্রতী হতেও সম্মত হলেন। আগেই বলা হয়েছে, শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। দেবতারা তখন নিদ্রিত। কাজেই ঐ সময় তাঁদের পূজা করতে হলে প্রথমে তাঁদের জাগরিত করতে হবে। তাই দেবীকে জাগরিতা করবার জন্য ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে করজোড়ে দেবীর স্তব করলেন– "হে দেবি! তুমি গিরিবাসিনী ও বিল্বদলবাসিনী, তুমি দুর্গা, দুর্গতিহরা, শান্তা, শান্তজনপ্রিয়া, পদ্মালয়া, পদ্মনয়না ও সহস্রদলবাসিনী। হে দেবি! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি লজ্জা, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই ত্রিবিধপ্রসবিনী; তোমাকে নমস্কার।' ❑

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য

বিভূতিসুন্দর ভট্টাচার্য

সেই প্রাচীন কাল থেকে সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি আর ধন-সম্পদের দেবী হিসেবে লক্ষ্মীর আরাধনা প্রচলিত। আশ্বিনের কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর ঐতিহ্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

সেদিন বাংলার ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি মুখরিত সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর আরাধনা হলেও ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে লক্ষ্মীপুজো হয় দীপাবলির সন্ধ্যায়। গবেষকদের মতে, বাংলার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে কৃষি সমাজের গভীর প্রভাব। অবশ্য তার প্রমাণও মেলে পুজোর উপকরণ আর আচার অনুষ্ঠানে।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে দেবী মর্তে আবির্ভূতা হন। তাই সারা রাত জেগে তাঁর উপাসনা করার এই রেওয়াজ। অনেকেই মনে করেন কোজাগরী শব্দটি 'কে জাগরী' বা 'কে জেগে আছে' থেকে এসেছে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে আলপনা। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ্মীপুজোর আল্পনাতেও দেখা যায় আঞ্চলিকতার প্রভাব। এখনও গ্রামাঞ্চলে ঘরের দরজা থেকে দেবীর আসন, ধানের গোলা পর্যন্ত আল্পনায় ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেওয়া হয়।

পুজো হয় মূলত প্রতিমা, সরা, নবপত্রিকা কিংবা কলার পেটোর তৈরি নৌকায়। একে বলে বাণিজ্যের নৌকা কিংবা সপ্ততরী নৌকা। লক্ষ্মীর সরাও হয় নানা রকম, যেমন ঢাকাই সরা, ফরিদপুরি, সুরেশ্বরী এবং শান্তিপুরী সরা। নদিয়া জেলার তাহেরপুর, নবদ্বীপ এবং উত্তর চব্বিশপরগনার বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্মী-সরা আঁকা হয়। তবে আঞ্চলিকতা ভেদে লক্ষ্মী-সরায় তিন, পাঁচ, সাত পুতুল আঁকা হয়। এতে থাকে লক্ষ্মী, জয়া-বিজয়াসহ লক্ষ্মী, রাধাকৃষ্ণ, সপরিবার দুর্গা ইত্যাদি। ফরিদপুরের সরায় দেব-দেবীরা সাধারণত একটি চৌখুপির মধ্যে থাকেন। আবার সুরেশ্বরী সরায় উপরের অংশে মহিষমর্দ্দিনী আঁকা হয় আর নীচের দিকে থাকেন সবাহনলক্ষ্মী।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোতে দেখা যায় জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক আচার-অনুষ্ঠান। এখনও ঘরে ঘরে প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করে তাঁর আরাধনা করা হয়। উপচারে ফল মিষ্টি ছাড়াও থাকে মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি। লক্ষ্মীর আচার-অনুষ্ঠানেও দেখা যায় নানা ধরনের তাৎপর্য। কোনও কোনও পরিবারে পুজোয় মোট ১৪টি পাত্রে উপচার রাখা হয়। কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ধান, পান, কড়ি, হলুদ ও হরিতকী দিয়ে সাজানো হয় পুজো স্থানটিকে। পুজোর উপকরণ এবং আচার-অনুষ্ঠান দেখে অনুমান করা যায় এর নেপথ্যে থাকা কৃষি সমাজের প্রভাব। কিছু কিছু জায়গায় লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে মেলা বসে। কোথাও বা নৌকাবাইচও অনুষ্ঠিত হয়।

> কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোতে দেখা যায় জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক আচার অনুষ্ঠান। এখনও ঘরে ঘরে প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করে তাঁর আরাধনা করা হয়।

ভারতে লক্ষ্মীপুজোর ইতিহাস বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদে লক্ষ্মীর কোনও সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও শ্রী শব্দের উল্লেখ রয়েছে বেশ কয়েকবার। এখানে শ্রী অর্থে সৌন্দর্যের আধার। যদিও পরবর্তীকালে শ্রীসুক্তে অবশ্য উল্লেখ রয়েছে শ্রী নামক এক দেবীর, যিনি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। সেই আদি যুগ থেকেই লক্ষ্মীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পদ্ম। তাই তিনি পদ্মাসনা,

আলপনা এঁকে সাজিয়ে দিলাম পট...

পদ্মালয়া। যুগ যুগ ধরে লক্ষ্মীকে বিভিন্ন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে শ্রী তথা লক্ষ্মীকে আদিত্যের দুই পত্নীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদে উল্লেখ মেলে পুণ্যালক্ষ্মী এবং পাপী লক্ষ্মীর। রামায়ণে সীতাকে লক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনী হল, সমুদ্রমন্থনের সময় লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি ...

তবে শুধু হিন্দু ধর্মে নয়, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও উল্লেখ রয়েছে দেবী লক্ষ্মীর। যেমন বৌদ্ধ 'অভিধানপ্পদীপিকা'-তে তিনি সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির দেবী। তেমনই 'শালিকেদার' এবং 'সিরি-কালকন্নি' জাতকে তাঁকে সৌভাগ্য ও জ্ঞানের দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার বৌদ্ধতন্ত্রে তিনি বসুধারা নামে পূজিত হতেন। তিনি দেবী লক্ষ্মীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ। অন্য দিকে জৈন ধর্মে তাঁর উল্লেখ রয়েছে মহাবীরের মাতা ত্রিশলা, যে রাতে জিনকে স্বপ্নে ধারণ করেছিলেন সেই রাতেই গজলক্ষ্মীকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলায় এমনকী মুদ্রায় দেবী লক্ষ্মীর অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলায় ভারহুত, সাচী কিংবা অমরাবতীর ভাস্কর্যে লক্ষ্মীর সন্ধান মেলে। ভারতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের, বেসনগরের যে কল্পবৃক্ষ রয়েছে তাতে প্রচুর ধন-সম্পদের সঙ্গে শঙ্খ ও পদ্মের চিহ্ন দেখা যায়। গবেষকদের মতে এই কল্পবৃক্ষের সঙ্গে কুবের অথবা লক্ষ্মীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় গজলক্ষ্মী কিংবা অভিষেক রত লক্ষ্মীর অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। লক্ষ্মী মূলত দ্বিভুজা অথবা চতুর্ভুজা হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি বহুভুজাও। ❑

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥
[অ : ১৮, শ্লোক : ৩০]

অনুবাদ ঃ হে পার্থ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য (বিহিত কর্ম) ও অকর্তব্য (নিষিদ্ধ কর্ম), ভয়ের কারণ–সংসারপ্রসূ অজ্ঞান এবং অভয়ের কারণ–সংসারনাশক জ্ঞান, সহেতুক বন্ধন এবং সহেতুক মোক্ষ–এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। *[অ : ১৮, শ্লোক : ৩০]*

দীপান্বিতা

পণ্ডিত প্রবর জ্যোতির্ময়

জোতিষা বাধতে তমঃ– ঋগ্বেদ।

দীপান্বিতা বা দীপাবলি অমাবস্যা তিথি আশ্বিন মাসে মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গামাতার মহাপূজা ও লক্ষ্মীপূজার পর কার্তিক মাসে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষে হিন্দু নর-নারীর মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। দিবাভাগে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ, রাত্রিকালে মহামায়া শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজা এবং ব্যাপকভাবে আলোকসজ্জা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুধর্ম দর্শনে পরলোকগত পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মন্ত্রসমূহের ভাবার্থ মৃত পিতা-মাতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তৎসহ বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল আধারের প্রতি। যেখানে যত ধার্মিক বা পাপী আত্মা আছেন, তাঁহাদের সহিত শ্রাদ্ধতর্পণকর্তার কোনও কালে কোনও দৈহিক সম্বন্ধ ছিল কিংবা ছিল না– সকল আত্মার তৃপ্তি ও আনন্দের জন্য জলাঞ্জলি ও পিণ্ডাদি প্রদত্ত হয়। ভক্তগণ পিতৃপুরুষ ও বিশ্বের সকল আত্মার কল্যাণের জন্য গীতাভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ ও উপনিষদ পাঠ করেন। ঈশ্বরের নাম জপসংকীর্তনাদি করেন। যাঁহারা জন্মান্তর, পরলোক, জীবাত্মার নিত্যত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাহাদের সকলেই একথায় একমত যে, যে-সকল পূর্বপুরুষের বিশেষত পিতা-মাতার কৃপায় আমরা পৃথিবীতে মানব জন্মলাভ করিলাম, তাঁহাদের প্রতি সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা আবশ্যক। শাস্ত্র বলেন, পিতা-মাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পূজা ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। উপনিষদ বলিয়াছেন, "মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব"। মহালয়ার অমাবস্যার ন্যায় দীপান্বিতাও পিতৃপূজার একটি শ্রেষ্ঠ তিথি।

শাস্ত্র বলেন, পিতা-মাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পূজা ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। উপনিষদ বলিয়াছেন, "মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব"। মহালয়ার অমাবস্যার ন্যায় দীপান্বিতাও পিতৃপূজার একটি শ্রেষ্ঠ তিথি।

দিবাভাগে পিতৃলোকের পূজায় পবিত্র হইয়া রাত্রির ঘোর অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মশক্তি শ্রীশ্রীকালীমাতার আরাধনায় ভক্ত নিবিষ্ট হয়েন। অমানিশার নিবিড় তিমিররাশির মধ্যে মহামেঘবর্ণা জগজ্জননীর ধ্যান অর্চনা করেন মাতৃসাধকগণ। কিন্তু কোটিসূর্য সমুজ্জলা আবার কোটি চন্দ্র সুশীতলা বিশ্বমাতার ব্রহ্মচৈতন্যের অনুপম জ্যোতিতে তাঁহাদের হৃদয়ের সকল অন্ধকার অজ্ঞান তমোরাশি চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়। তাঁহারা হন আত্মজ্যোতি আত্মারাম আত্মতৃপ্ত। দীপান্বিতার রাত্রিতে চতুর্দিকে প্রদীপাদি প্রজ্বালন এবং বিবিধ আলোকের ঘটা সেই জ্যোতির্ময়ী মহাজননীর দিব্যালোক প্রভায় সাধকের অন্তস্তলে দিব্যজ্যোতি প্রকাশেরই একটি প্রতীক বা বাহ্যরূপ। কংস-কারাগারে অত্যাচারে ক্লিষ্ট বসুদেব-দেবকীর দুঃখ নিবারণের জন্য রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে পরম পুরুষ অবতীর্ণ হন। তাঁহার ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভায় কারাগৃহ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। যিনি ব্রহ্ম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তিনিই ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রী কালী। ব্রহ্মপুরুষের লিঙ্গভেদ নেই। একই নিত্য সত্য সনাতন বস্তু নানা রূপে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া পূজা গ্রহণ করেন। তিনিই জগতের পিতা-মাতা। তাঁর ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য, করুণা ও বৈচিত্র্য অসীম। পাপী ও অত্যাচারীর নিকট তিনি দণ্ডদাতা– 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাম্।– অনুগত ভক্তের নিকট অতি প্রসন্নবদন। আলোর দেবতা এই কালো মেয়ে। তাঁর রূপের ছটায় বিশ্বভুবন দেব-দেবী, গ্রহ-তারকা, বৃক্ষ-লতা সূর্য-চন্দ্র, অগ্নি-বিদ্যুৎ সবই উদ্ভাসিত। তাঁর কৃপায় মন বিশুদ্ধ হয় এবং জীবন পবিত্র হয়। আজ সমগ্র বিশ্বে যেরূপ নৈতিক অধঃপতন ও আসুরিক ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রশমনের জন্য আসুন আমরা সমস্বরে জগজ্জননীর নিকট দীপান্বিতার পুণ্যলগ্নে প্রার্থনা জানাই– 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়' এবং 'পাপানি সর্বজাগতাঞ্চ সমং নয়াশু উৎপাত পাক জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান'। ❑

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥
[অ : ৬, শ্লোক : ৪৬]

অনুবাদ ঃ যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও। *[অ : ৬, শ্লোক : ৪৬]*

দীপাবলী

শ্রীশ্রী আনন্দ মূর্তি

সংস্কৃতের 'ক', 'ত', 'প', 'দ' প্রাকৃতে 'অ' হয়ে যায়। তাই 'দীপ' হয়ে যায় 'দীয়'। দীপ মানে আগুনের শিখা অথবা কোন একটা ছোট পাত্রে আগুন জ্বলছে। প্রদীপ মানে কোন একটা বড় পাত্রে শিখা জ্বলছে, দীপক মানে ছোট কী বড় দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু গরম লাগছে। যেমন দীপক রাগ যা শুনে শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে। হেমন্ত ঋতুর গোড়াতে প্রচুর কীট-পতঙ্গ জন্মায় যারা ফসলের ক্ষতি করে। কীট-পতঙ্গের স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে আগুন দেখলেই তার দিকে ছুটে যায়। এই কীট-পতঙ্গরা ফসল নষ্ট করে দেয় বলে চতুর্দশী রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হত। তারা সেদিকে ছুটে এসে পুড়ে মরত। এতে ফসল তাদের হাত থেকে বেঁচে যেত। চতুর্দশী তিথি সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। এতে যদি আলো জ্বালা হয় তাহলে সব পোকা আলোর কাছে এসে পুড়ে মরে যাবে, শস্য বেঁচে যাবে। এটাই হ'ল মুখ্য জিনিস, আসল জিনিস।

এই যে জিনিসটা এটা করাবার জন্যে তাই দু'টো দিক আছে। একটা দিক ছিল প্রাচীনকালে তন্ত্রের সাধনা। তন্ত্রের সাধনা হ'ল অন্ধকারে আলোকের আহ্বান। অন্ধকারের ভেতরে আমি আলো খুঁজব। অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের মধ্যে আলোর প্রভা জ্বেলে দোব। দীপজ্ঞান এনে দোব ভেতরে বাইরে। তা সেইজন্যে বলা হচ্ছে তন্ত্রে, এই তিথিতে প্রাচীনকালের বৌদ্ধতন্ত্রে তারা শক্তির পূজা করত। তোমরা আবার এই রকম ভেবো না যে, সবই আমাদের দেশের জিনিস, সবই বেদে আছে। তা নয়। এই তারাতন্ত্র চীন থেকে এসেছিল, এনেছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। তা সেইজন্যে তান্ত্রিকদের কাছে অমানিশার অন্ধকারের গুরুত্ব আছে।

বাংলায় এই তারা দেবীরই রূপ হয় শ্যামা। কালিকা শক্তি ও তারা শক্তি বৌদ্ধতন্ত্র ছেড়ে যখন পৌরাণিক তন্ত্র নিল তখন তারা তারা-শক্তিকেও কালী বলতে শুরু করল আর শ্যামাকেও কালী বলতে শুরু করল। পাঁজিতে লেখা আছে শ্যামা পূজা। তোমরা বল কালী পূজা। এইসব এক করে দেওয়া হ'ল। এই তন্ত্রের মহানিশাতে সাধারণত এটা করতে হয়, তার প্রাক্কালীন ব্যবস্থা হিসেবে চতুর্দশীতে চৌদ্দোটা প্রদীপ জ্বালানো হত। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আমি এবার পরের দিন ভাল করে আলো জ্বালব, অন্ধকারে আলোক সম্পাত করব। এই রকম আইডিয়া ছিল। আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্প– সে তো তোমরা জান।

বাংলায় এই তারা দেবীরই রূপ হয় শ্যামা। কালিকা শক্তি ও তারা শক্তি বৌদ্ধতন্ত্র ছেড়ে যখন পৌরাণিক তন্ত্র নিল তখন তারা তারা-শক্তিকেও কালী বলতে শুরু করল আর শ্যামাকেও কালী বলতে শুরু করল। পাঁজিতে লেখা আছে শ্যামা পূজা। তোমরা বল কালী পূজা।

একবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার বাইরে গেছলেন। সেই সময় নরকাসুর নামে একজন অনার্য সর্দার দ্বারকা আক্রমণ করেছিল। যুদ্ধে নরকাসুরের মৃত্যু হয়েছিল। সেদিন ছিল চতুর্দশী তিথি। এই নরকাসুর চতুর্দশী তিথিতে চৌদ্দটা প্রদীপ জ্বেলে উৎসব করেছিল আর পরের দিন অমাবস্যাতে সত্যভামার পুজো করা হয়েছিল। সত্যভামাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল মহালক্ষ্মী দেবী। সেই জন্যে পশ্চিম ভারতের লোকেরা নরক চতুর্দশী বলে, বাংলার লোকেরা বলে ভূত চতুর্দশী। বাংলায় তন্ত্র সাধনা হত কার? সেই বৌদ্ধ তারা দেবীর। কালিকারও নয়, শ্যামারও নয়। আর তারা দেবীর তিনটি নাম ছিল– ভ্রামরী তারা, তিব্বতে নাম নীল সরস্বতী বা বজ্রতারা আর বাঙালীস্তানে উগ্রতারা। তারার বিভিন্ন প্রকারভেদ হয়েছে।

চীনের প্রাচীন গুহাতে তারা দেবীর অজস্র মন্দির রয়েছে। গর্বিত দানব খর্বাকৃতি খড়্গ খর্পরা নীল সরস্বতী।/ সর্বসৌভাগ্য প্রদায়িণী কর্ত্রী নমস্তে তারারূপা তারিণী।। এই শ্লোকটার মধ্যে নীল সরস্বতীর কথা রয়েছে। এই নীল সরস্বতীই ১৩০০ বছর আগে পৌরাণিক সরস্বতী হয়ে গেছে। যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা যা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা।/ যা বীণাবরদমণ্ডিত করা যা শ্বেতপদ্মাসনা ॥/ যা ব্রহ্মচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈ সদা বন্দিতা।/ সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা ॥ সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র। নীলসরস্বতী থেকে সাদা হয়ে গেল। যা হোক, পশ্চিম ভারতের লোকেরা (গুজরাট, রাজস্থান) ওই সময় মহালক্ষ্মীর পুজো করবে। অর্থাৎ সত্যভামার পুজো করে। যেহেতু মহালক্ষ্মীর পুজো করবে সেই হেতু নিউ এ্যাকাউন্টও খুলবে দেওয়ালীতে। দেওয়ালীতে বছর শুরু হবে। চান্দ্র বৎসর গোণা শুরু হবে।

যাই হোক, এ এক রকমের নিয়ম নিল তান্ত্রিক প্রথা, আরেক রকমের নিয়ম নিল পৌরাণিক প্রথা। আসল উদ্দেশ্য হ'ল আগুন জ্বেলে পোকা মারা। আবার বর্ধমান মহাবীরের মৃত্যু হয়েছিল এই কার্ত্তিকী অমাবস্যায়। সবাই কাঁদছে। তিনি বলে গেছলেন অমাবস্যা তিথিতে তোমরা কাঁদবে না। সে অন্ধকারে তোমাদের শোক আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই তোমরা সে অন্ধকারকে ভোলবার জন্যে খুব আলোকোৎসব করবে। তাই জৈনরা ওইদিন দীপাবলী করে এই অন্ধকারকে ভোলবার জন্য। বর্ধমান মহাবীরের মৃত্যুশোককে ভোলবার জন্যে। ❑

বসন্ত পঞ্চমী হয়ে উঠল নিবেদিতা পঞ্চমী

সুচেনা সরকার

হৈ হৈ করে এসে পড়েছে শীত। হাড় কাঁপানোই বটে। দিনের বেলা মাইনাস তিন/চার ডিগ্রি ঠাণ্ডা অনেক দিন দেখেনি লণ্ডন। ভারী ভারী কোট-টুপি-মোজায় ধোপদুরস্ত বাঙালির একদম ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। সকালবেলা গাড়ি পরিষ্কার করার জন্য দশ-পনেরো মিনিট চলে যাচ্ছে। বরফ পরিষ্কার করতে করতে হাত জমে প্রায় কালশিটে।

ক্রিসমাসের ডেকরেশন নামতে না নামতেই এসে গেল বসন্ত পঞ্চমী! অন্য বছর এই সময় মাথা তুলে উঁকি মারে ড্যাফোডিল, নার্সিসাস, কুচি কুচি সাদা সাদা স্নো ড্রপ ফুল। এ বার কোথায় কী? কিন্তু, তাই বলে সরস্বতী পুজো তো আর আটকে থাকবে না। তিনি এ বার 'রিইনকার্নেশন' করে সোজা কুমোরটুলি থেকে হাজির ক্রয়ডন বেঙ্গলি কানেকশনের মঞ্চে। স্যুটকেসবন্দি পাটের দড়ির বাদামি সরস্বতী ভিসার কড়াক্কড়ি পেরিয়ে দিব্বি চলে এসেছিলেন টেমসের পারে। বছর পাঁচেক পর যখন সরস্বতীর আবার মেক-আপের প্রয়োজন পড়েছে ঠিক তখনই ছুমন্তরে হয়ে গেলেন একেবারে শোলার কাজের ধবধবে শ্বেতশুভ্রা বীণাপাণি।

সরস্বতী পুজো নিয়ে কচি-কাঁচাদের আনন্দ দেখার মতো। প্রতি বারের মতো এ বারেও নাটকে মেতে উঠেছে তারা। এটাই তাদের নিজেকে চেনার সময়। কখনও কাবুলিওলা, কখনও টুনটুনির গল্প, কখনও বা সুকুমার রায়। আগের বারের থিম ছিল সাতভাই চম্পা। এ ভাবেই দ্বিতীয় প্রজন্ম চেনে নিজেদের, চেনে বাংলা গল্প, বাংলায় হাসে, ভালবাসে, নাচে, গায়। কিচিরমিচির করে রিহার্সাল করে প্রতি সপ্তাহান্তে। হোমওয়ার্কের খাতা গুটিয়ে রেখে আনন্দমেলার সময় এটা। সত্যি বলতে ওদের জন্যেই না এত কিছুর আয়োজন।

সরস্বতী পুজো নিয়ে কচি-কাঁচাদের আনন্দ দেখার মতো। প্রতি বারের মতো এ বারেও নাটকে মেতে উঠেছে তারা। এটাই তাদের নিজেকে চেনার সময়। কখনও কাবুলিওলা, কখনও টুনটুনির গল্প, কখনও বা সুকুমার রায়। আগের বারের থিম ছিল সাতভাই চম্পা।

এ বছর তাদের দেওয়া হয়েছে অন্য রকম গল্প। গল্পের শুরু বিংশ শতকের শুরুর দিকের কলকাতায়। হাটখোলা দত্তবাড়ির মেয়ে লাবণ্যময়ী দত্ত ছিলেন নিবেদিতা স্কুলের প্রথম দিকের ছাত্রী। সিস্টার ক্রিস্টিনের কোলে চড়ে স্কুলে আসতেন। তখনকার দিনে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার কোনও অনুমতি ছিল না, নিবেদিতা এসে ভিক্ষে করে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লাবণ্যের বোনদের তাঁর বাবা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে। নিজের স্কুলের ছাত্রী হিসেবে। সেই গল্পে একে একে এসেছে ক্রিস্টিন, নিবেদিতা, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে। কলকাতায় স্কুল শুরুর অনেক আগের গল্প, মার্গারেট থেকে নিবেদিতা হওয়ার গল্প। ইসাবেলা মার্গেসনের সেন্ট জর্জেস ড্রাইভের বাড়িতে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কথা। ছাত্রীদের দিয়ে প্রথম ভারতের পতাকা আঁকিয়েছিলেন যে নিবেদিতা। লাল-হলুদ সেই পতাকার মধ্যখানে ছিল বজ্রচিহ্ন। সে কথা অনেকেরই অজানা ছিল, নাটকের মধ্যে দিয়ে জানল সকলে, শুধু বাচ্চারা নয়, জানল তাদের মা-বাবাও।

সরস্বতী পুজোয় বাচ্চাদের প্রতিবার একটি করে ছবি দিয়ে দেওয়া হয়। তারা সেটা রঙ করে আনে। এবারে সেই ছবি হল বজ্রচিহ্ন দেওয়া পতাকা। কচি-কাঁচারা মহা উৎসাহে রং করে এঁকে নিয়ে এল সেই প্রথম পতাকা। এ ভাবেই প্রথম ভারত-পতাকার গল্প জানল পাঁচ থেকে পনেরো বছরের লণ্ডনের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালিরা। মেধাবী, চলতি কথায় স্ট্রিট-ওয়াইজ, আধুনিক প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়, তবু তারা কিন্তু শ্রদ্ধাশীল ভারতের ইতিহাসের প্রতি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই শব্দের উপর সমান ভাবে আগ্রহী ক্রয়ডনের এই দ্বিতীয় প্রজন্ম।

নাটকে এক এক জন দেবশিশু সমবেত কণ্ঠে আগের বার গেয়েছিল 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' এ বারে তারা গেয়েছে বন্দেমাতরম। ওল্ডপ্যালেস স্কুলের ছাদ ফুঁড়ে সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে যেন। পুরো গানের কঠিন তৎসম শব্দগুলি শুদ্ধতায় উচ্চারিত হয় শিশুকণ্ঠে। 'কোটি কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে'– গায়ে কাঁটা দেয় সভাশুদ্ধ জনতার। নাটকের মূল চরিত্র লাবণ্যদের স্কুলেও তো এই গানই গাওয়া হত।

ক্রয়ডন বেঙ্গলি কানেকশন নিবেদিতার উইম্বলডনের বাড়িতে নীল ফলক বসিয়ে চিহ্নিত করার জন্যে আবেদন করেছিল ইংলিশ হেরিটেজের কাছে। সঙ্গে ছিলেন আরও কিছু মানুষ। সেই আবেদন অবশেষে মনোনীত হয়েছে। শুধুমাত্র কয়েকটি অফিসিয়াল স্টেপ বাকি আছে। সম্ভবত আগামী ২৪ অক্টোবর উইম্বলডনের ওয়ার্পল রোডের বাড়িতে ব্রিটিশ হেরিটেজের নীল ফলক বসবে।

ক্রয়ডন বেঙ্গলি কানেকশনের শিশুরা এই ঘটনার সূচনা করে দিল লণ্ডনের হিমশীতল সরস্বতী পুজোর এই দিনে। বাঙালির ভ্যালেন্টাইন, জোড়া ইলিশ, গোটা সেদ্ধ, বই পুজো, সব কিছুই রইল। খিচুড়ি বাঁধাকপি কুলের চাটনি তাও বাদ গেল না। সঙ্গে রইলেন নিবেদিতাও। তাই এ বারের বসন্ত পঞ্চমী হয়ে উঠল নিবেদিতা পঞ্চমী। ❑

শিবরাত্রি মোটেই মেয়েলি ব্রত নয়

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

শিবের মতো বর পাওয়ার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। স্বামী, সন্তানের কল্যাণ কামনাও মূল কথা নয়। পাল রাজাদের আমলে ছিল হরগৌরী। মুঘল আমলে গ্রামে গ্রামে শিবমন্দিরে শুরু হয়ে গেল শিবলিঙ্গের পূজা।

গবেষণাপত্রের বাইরে আজ আর মেয়েলি ব্রত, ব্রতকথা এ সবের অস্তিত্ব আছে না কি? শিবরাত্রির উৎসব দেখলে অবশ্য এমন সন্দেহ মনে রাখার কোনও কারণ নেই। বাংলার গ্রামে-শহরে ছড়ানো হাজার হাজার শিবমন্দির যেন ফাল্গুন মাসে জেগে ওঠে শিবরাত্রি উপলক্ষে। শহরের অলিতে গলিতে অজস্র শিবমন্দিরের অস্তিত্ব হঠাৎ টের পাওয়া যায় তারস্বরে বাজানো চটুল গানের দৌলতে। হবে না-ই বা কেন, সব ব্রতের মধ্যে শিবরাত্রিকেই তো শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে ধরা হয়। এই ব্রত পালন করলে নাকি নারীর সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়– পতিকামনা, পুত্রকামনা, বৈধব্য খণ্ডন ও সাংসারিক মঙ্গল। মধ্যযুগের যে সমাজে এই ব্রতের প্রচলন হয়, সেখানে মেয়েদের তা সে কুমারী সধবা বা বিধবা যাই হোক না কেন পরিবারের বাইরে অন্য কিছু চাইবার মতো কোনও ফাঁকই রাখা হয়নি। আজ পরদা সরেছে, কিন্তু সংস্কার কাটেনি, কিংবা সংস্কার আরও অনেক সংস্কারের মতোই হয়ে উঠেছে নিছক বাৎসরিক উৎসব।

ব্রতকথা অনুযায়ী, শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং। পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– প্রভু, এমন এক সহজ ব্রত বলে দিন, যা সকলেই পালন করে পাপমুক্ত হতে পারে। মহাদেব বললেন, 'ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি হয়, তা-ই শিবরাত্রি। শিবরাত্রিতে যে উপবাস করে, আমি তার উপর খুব সন্তুষ্ট হই। শিবরাত্রিতে চার প্রহরে চারটি গঙ্গামাটির শিব গড়ে পূজা করবে। ওই দিন রাত্রি জাগবে, পুজোর উপকরণ সরল, বেলপাতা আর গঙ্গাজলই যথেষ্ট। জটিল মন্ত্রতন্ত্র কিছু নেই, দীর্ঘ প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। সাধে কি আর সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্রত, সহজে পাপমুক্তি আর সপরিবার মঙ্গলের ব্যবস্থা।

শুধু কি তাই? শিবরাত্রি মোটেই শুধু মেয়েদের পালনীয় ব্রত নয়। ছেলেরাও শিবরাত্রি করতে পারে। করেও। আসলে প্রথম শিবরাত্রি তো করেছিল এক জন পুরুষই সে গল্পও শুনিয়েছেন শিব। বারাণসীর এক ব্যাধ ধর্ম-কর্মের বালাই নেই, পশুহত্যাই তার জীবিকা। পাপের ভারা তাই কানায় কানায় পূর্ণ। সারা দিন শিকারের পর ক্লান্তিতে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, সন্ধে হয়ে যাওয়ায় বাড়ি যেতে পারবে না ভেবে সে গাছের ডালেই রাতটা কাটিয়ে দেয়। গাছটা ছিল বেলগাছ, আর তলায় ছিল একটা শিবলিঙ্গ। ব্যাধের গায়ে লেগে একটা বেলপাতা শিশিরের জলের সঙ্গে মিশে শিবের মাথায় পড়ল। সেটা ছিল শিবরাত্রি, আর ব্যাধও ছিল উপবাসী। পর দিন বাড়ি ফিরে স্নান করে সে দেখে, এক অতিথি উপস্থিত। তাঁকে খাইয়ে তার পরেই ব্যাধ নিজে খেয়েছিল। ফলে তার ব্রত পালন ঠিকমতই সম্পন্ন হল। ব্যাধ মারা যাওয়ার পর শিবদূত আর যমদূতদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শেষে শিবের দূতেরাই জয়ী হল, আর যমরাজও স্বীকার করলেন, শিবচতুর্দশী করলে তার উপর আর যমের অধিকার থাকবে না। মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের এটাই একমাত্র উপায়, পার্বতীকে জানালেন শিব।

সত্যি, শিব তো আশুতোষ, খুব সহজেই তাঁর মন পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলায় তাঁর এত প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস কী? বাংলা এমনিতেই বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলের বাইরের দেশ ছিল। পালযুগের বাংলায় বৌদ্ধদের রমরমা, এমনকী বৌদ্ধ তন্ত্রেরও পীঠস্থান এই পূর্ব ভারত। তবে এরই মধ্যে পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল জুড়ে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের জন্য রাজা এবং অভিজাতদের বিপুল পৃষ্ঠপোষণাও নজরে পড়ে। পরে সুলতানি শাসনের ধাক্কায় অনেক দিনের নিস্তব্ধতা। মধ্যযুগের শেষ পর্ব থেকে এক দিকে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম, অন্য দিকে আধা-ব্রাহ্মণ্য আধা-লৌকিক শৈবধর্ম যে ভাবে ব্যাপ্ত হয় বাংলা জুড়ে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, এ জমি 'অন্য' মতবাদের জন্য কতটা উর্বর ছিল। অন্য সব দেব-দেবীকে এ ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছেন শিব। তিনি তো বৈদিক দেবতা নন, ঋগ্বেদে 'রুদ্র' ভয়ংকর দেবতা, কিন্তু শিবের কোনও উল্লেখ নেই, বরং সেখানে 'লিঙ্গপূজক' বিরোধী মনোভাবই নজরে পড়ে। ক্রমে শ্মশানবাসী শিব হিন্দুধর্মের তিন প্রধানের অন্যতম হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের দেবতা বলে সাধারণ ভাবে চিহ্নিত করা হলেও, শিবভক্তরা শিবকেই সব কিছুর স্রষ্টা ও সংহারকর্তা বলে মানেন। পৌরাণিক নানা কাহিনীতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর থেকে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা

হয়েছে। সব থেকে পরিচিত বোধহয় সেই স্তম্ভরূপী শিবের গল্প, যেখানে হংসের রূপ নিয়ে ব্রহ্মা স্তম্ভের শীর্ষ আর বরাহের রূপ নিয়ে বিষ্ণু তার তলদেশ নির্ণয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, ব্রহ্মা আবার মিথ্যে করে বলেন, তিনি শীর্ষদেশ দেখতে পেয়েছেন, তাতে শিব অভিশাপ দেন ভারতে আর ব্রহ্মার পূজা হবে না। শেষে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুজনেই শিবকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেন। শিবের লিঙ্গপূজা প্রচলনের গল্প আছে 'কূর্মপুরাণ'-এ। দেবদারু বনে তপস্যারত মুনিঋষিরা ছদ্মবেশী শিব আর বিষ্ণুকে চিনতে পারেননি, নানা ঘটনার পর প্রকৃত রূপ দেখে তাঁর বন্দনা করেন এবং লিঙ্গপূজা প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলে নিজের জায়গা করে নিতে ভূতপ্রেত নিয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে হয়েছিল শিবকে, নাচতে হয়েছিল প্রলয়নাচন। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও শিবের মধ্যে সেই দ্বৈত সত্তাই থেকে গিয়েছে– এক দিকে তিনি শ্মশানের দেবতা, ভূতপ্রেত তাঁর অনুচর, কাপালিকরা তাঁর সাধক; অন্য দিকে তিনি কৈলাসে পার্বতী কার্তিক গণেশকে নিয়ে ঘোর সংসারী। আর এই সংসারী, সহজে সন্তুষ্ট, আলাভোলা শিবকে কাছের করে নিতে মধ্যযুগের বাঙালির কোনও অসুবিধেই হয়নি।

শিবকে ঘরের লোকে পরিণত করার কালিক প্রয়োজন ছিল, জমিও তৈরি ছিল। শেষ দিকের পালরাজাদের লিপি থেকে বেশ কিছু শিবমন্দির তৈরির কথা জানা যায়। প্রাচীন পাশুপত সম্প্রদায়ের শৈবদের জন্য রাজানুগ্রহের কথাও আছে সেখানে। সুন্দরবনে জটার দেউল, বর্ধমানের রাঢ়েশ্বর, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর ষাঁড়েশ্বর শৈলেশ্বর-এর মতো আটশো-হাজার বছরের শিবমন্দির টিকে আছে এখনও। পাল-সেন যুগের বাংলায় শিবের যে সব মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে লিঙ্গমূর্তি বাদ দিলে শিব-পার্বতীর মূর্তি, বিশেষত উমা-মহেশ্বরের সংখ্যা খুবই বেশি। অর্থাৎ বাঙালি মননে একক শিব নয়, হরগৌরীর কল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে। শিব ও শক্তির এই সব যুগ্মমূর্তির পিছনে সে কালের তন্ত্রচর্চার প্রভাব দেখেছেন কেউ কেউ। সে যাই হোক, শিব ও পার্বতীর পারিবারিক রূপ যে ভাবে পরে বাঙালির সমাজ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল, তার সূত্র কিছুটা হলেও যে এর মধ্যে থেকে গিয়েছে, সন্দেহ নেই।

তেরো শতক থেকে পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল। মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর প্রথম কয়েক শতক বিশাল মন্দির তৈরি দূরের কথা, বড় আকারের পাথরের মূর্তি তৈরির পৃষ্ঠপোষকও রইল না। আক্রমণের ভয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হল দেব-দেবীর মূর্তি, পুঁতে ফেলা হল মাটির নীচে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে সমাজকে আবার ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু হল। দেখা গেল, দিনকাল বদলে গিয়েছে। যে বিষ্ণু বা সূর্যের মূর্তি এর আগে বাংলার সর্বত্র পাওয়া গিয়েছে, সেই দেবতাদের পূজা আর ফিরল না। মুঘল আমলে এক দিকে চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম যেমন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আনুকূল্য নিয়ে সবাইকে টানল, তেমনই শিবের মাহাত্ম্য সবার মন জয় করে নিল। বাংলার প্রতি গ্রামে গড়ে উঠল ছোট-বড় শিবমন্দির, পূজার চল হল লিঙ্গমূর্তিতে। দ্বাদশ শিব, ১০৮ শিবমন্দির তৈরি করে অভিজাতরাও পুণ্যের ভাগ নিতে এগিয়ে এলেন।

অন্দরমহলের দরজাও কি আর বন্ধ থাকে, ব্রতকথার মাধ্যমে শিব চলে এলেন ঘরের ভিতরে। কৃষিজীবী সমাজের প্রাত্যহিক যাপনেও মিশে গেল শিবের উৎসব সারা বাংলা জুড়ে, আজও চৈত্র-বৈশাখে 'গাজন' হয়, যে নাম নাকি এসেছে শিববিবাহের এই লৌকিক উৎসবে সমবেত মানুষের গর্জন থেকে। রাঢ়রে সব থেকে বড় লোক-উৎসব গাজন, উত্তরবঙ্গে আবার তারই নাম গম্ভীরা। গাজনের গানে লৌকিক শিবের কত না কীর্তিকলাপ চাষ-বাস শুরুর গল্প বোধহয় সব থেকে আগ্রহ জাগায়। 'শিবায়ন' কাব্যেও আছে এমন গল্প। পার্বতীর পরামর্শে শিব চাষে মন দিলেন। জমি কই? ইন্দ্রের কাছে শিব জমি চাইলেন। ইন্দ্র আদিগন্ত পতিত জমি দিলেন চাষের জন্য। যম দিলেন তাঁর মহিষ, শিবের ষাঁড় আর যমের মহিষ হাল চষবে। বিশ্বকর্মা চাষের যন্ত্রপাতি বানালেন, বীজ দিলেন কুবের। হাল চষার জন্য এলেন ভীম, দশমনি কাস্তে দিয়ে ফসলও কাটলেন। ধান হল মাত্র দু'হাল। শিব বললেন, ধান পুড়িয়ে দাও। ভীম ধানে আগুন দিয়ে ফুঁ দিলেন ধান পুড়তে লাগল, পুড়তেই লাগল। এ থেকেই তৈরি হল নানা রঙের ধান। এ গল্পের নানা মাত্রা কল্পনা করা কঠিন নয়।

অর্থাৎ শুধু শিবরাত্রিতে শিবের মাথায় জল ঢেলে ভাল বর চাওয়া নয়, শিবের মহিমা মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকটাই ব্যাপক। গবেষকদের মতে, বাংলায় এর উৎস আরও দূর অতীতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক রজত সান্যাল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চন্দ্রকেতুগড় তিলপি তমলুক তিলদা মঙ্গলকোট বাংলার বিভিন্ন প্রাচীন প্রত্নস্থলে পাওয়া লিঙ্গবেষ্টনকারী বিচিত্র নারীমূর্তির ভাস্কর্যের দিকে। তাঁর কথায়, এখনও এগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, কিন্তু শৈব কাল্ট-এর সঙ্গে এর যোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। আর তা হলে অবশ্যই এ বিষয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ আছে। ❑

দেবী কালী নানা রূপে, নানা মনে

হরপ্রসাদ সেনশর্মা

মা কালী, ভক্ত সন্তানদের দেখা দেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার সমাধানে পথ নির্দেশ করেন। এই জাতীয় গভীর বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে বিদ্যমান। মা কালী হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া। দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা হলেন কালী। পুরাণ-আশ্রিতা দেবী হলেও আজকের এই দেবীমূর্তির রূপান্তরের পিছনে কিন্তু একটা কাহিনী আছে। দেখা যাক, কী সেই কাহিনী।

সপ্তদশ শতকে নদীয়া নবদ্বীপ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তিনি চৈতন্য সমসাময়িক হয়েও ঘোরতর চৈতন্যভাব বিরোধী ছিলেন। আমরা বর্তমানে যে কালীমূর্তি দেখি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আগে তা কল্পনার বাইরে ছিল। তখনও কিন্তু কালীপুজো হত তবে যন্ত্রে, ঘটে আর থানে। বিগ্রহ ছিল না। একদিন কৃষ্ণানন্দের মনে হল, মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে বিগ্রহ পুজো করবেন। কিন্তু সেই মাতৃমূর্তির রূপ কেমন হবে ঠিক করতে না পেরে পুজোর আসনে বসেই মায়ের কাছে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হঠাৎ মাঝরাতে তিনি শুনলেন, মা যেন বলছেন 'কৃষ্ণানন্দ, ভোরবেলায় যাকে প্রথম দর্শন করবি, তার মধ্যেই খুঁজে পাবি আমার রূপ। তুই সেইভাবেই আমাকে গড়ে পুজো করবি।'

> ঠাকুরের সাধনা কালীর আরাধনা। তাঁর কাছে কালীই হলেন আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে নিত্য এবং লীলাময়ী এই দুই রূপেই দেখেছেন। কালী নিত্যরূপে চিরন্তন ও শাশ্বতরূপে বিরাজিতা।

একটা চূড়ান্ত উত্তেজনায় কৃষ্ণানন্দের সারা শরীরটা যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তখন সবে ভোর হচ্ছে, কৃষ্ণানন্দ গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন, হঠাৎ দেখলেন এক গোপবধূ ঘরের দাওয়ায় গোবরমাটি দেওয়া শুরু করেছে। ডান পা এগিয়ে বাঁ-হাতের তালুতে মাটির তাল নিয়ে, ডান হাতে গোবরমাটি দিতে গিয়ে খোঁপা খুলে এলো চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে সিঁদুরের টিপটা ছড়িয়ে গিয়ে হাতেও লেগেছে। মাটির তালটি সে নিচে নামাতে যাবে, সেই সময় কৃষ্ণানন্দ গোপবধূকে দেখে প্রণাম জানালেন। গোপবধূ নবপুরুষ (কৃষ্ণানন্দ) দেখে জিভ কাটলেন। কৃষ্ণানন্দের ওই রূপ দেখে মন ভরে গেল। তাঁর মনের কল্পনার সঙ্গে ওই রূপের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি দেবী কালীর বিগ্রহ গড়ে তুললেন। কিন্তু তাঁর অঙ্গে বস্ত্র না থাকায় তিনি দিগম্বরী। এইভাবে তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আধুনিক কালীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত কালীমূর্তি পরবর্তীকালে বরাভয়দায়িনী দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হতে থাকেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণানন্দের সমসাময়িক হয়েও কিন্তু কৃষ্ণানন্দের ভাববিরোধী ছিলেন না। বরং চৈতন্য মহাপ্রভুর 'ভারত-পরিক্রমা' থেকে জানা যায় যে কাবেরী নদীর পাশ দিয়ে পথ চলার সময় তিনি শিবতীর্থ পীঠভৈরব মহেশ্বরকে দর্শন করেন। তারপর সেখান থেকে তিন মাইল দূরে শিবকালী গ্রামে এসে উপস্থিত হন। শোনা যায় দেবী কালী নিজে এখানে ভৈরবের সাধনা করেছিলেন। তাই গ্রামের নামেই দেবী এখানে 'শিয়ালী ভৈরবী' নামে পরিচিত। মহাপ্রভু এই মন্দির দর্শন করেন। মহামায়াকে দেবী কালিকারূপে দেখে প্রণাম জানিয়েছিলেন। দেবী এখানে 'হরমনোমোহিনী' রূপেই বিশেষভাবে খ্যাত। এই মূর্তি দর্শন করে তিনি পরমানন্দ লাভ করেছিলেন। এই পরম পবিত্র গ্রামে একটি রাতও তিনি অতিবাহিত করেন। তাই সেই গ্রাম আজও পরম তীর্থরূপে পরিচিত।

সাধক রামপ্রসাদ মা কালীর এক পরম ভক্ত। মাকে তিনি 'জগদীশ্বরী' বলে ডাকতেন। একসময় ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। দুর্যোগ কমার পর সাধক রামপ্রসাদ তাঁর মেয়ে জগদীশ্বরীকে নিয়ে বেড়া বাঁধার কাজে হাত দিলেন। বেড়া বাঁধতে বাঁধতে তিনি গান ধরেছেন– 'অপার সংসার নাহি পারাপার/ ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ/ বিপদে তারিণী, করগো নিস্তার।' শ্যামামায়ের স্নেহধারা ভক্ত-সন্তানের ওপর বর্ষিত হল। নিরাকার আকারে এসে কন্যা জগদীশ্বরী রূপ ধরে বেড়া বাঁধার কাজে সন্তানকে সাহায্য করতে লাগলেন।

এদিকে মেয়ে জগদীশ্বরী বাড়ি থেকে খেয়ে এসে দেখতে পেল, বেড়া বাঁধা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে তো রীতিমতো অবাক হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, এতটা বেড়া তিনি একা বাঁধলেন কী করে? বাবা সহজভাবে হাসতে হাসতে বললেন, সে-ই তো ছিল। তা না হলে এতটা কাজ এগোয়? বাবার কথা শুনে মেয়ে তো অবাক, কারণ সে তো ছিল না, বাড়িতে খেতে গিয়েছিল। মেয়ের কথা শুনে এবার রামপ্রসাদ সত্যিই বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি মেয়ে জগদীশ্বরীর রূপ ধরে মা তাঁর ঘরের বেড়া বেঁধে গেলেন? দু'চোখ জলে ভরে উঠল, মা'কে কাছে পেয়েও চিনতে না পারায় কষ্টে গেয়ে উঠলেন– 'নয়ন থাকতে দেখলে না মন/ কেমন তোমার কপাল পোড়া/ মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে/ বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।' আর একবার তিনি তাঁর স্ত্রী সর্বাণীর মধ্যেও শ্যামা মাকে দর্শন করে গেয়েছিলেন– 'আমি তাই কালোরূপ ভালবাসি/ কালো জগমোহিনী মা এলোকেশী।'

আবার, সাধক কমলাকান্তকে দেবী কালী বাগদি কন্যারূপে দেখা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর গান শুনে দস্যুদল তাঁকে মারার কথা ভুলে তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই জাতীয় কাহিনী আজও মানুষ শুনতে চায়, জানতে চায়। বোঝা যায় সমসাময়িক মানুষের মনে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন আজও তা অম্লান। মা'কে তিনি যখন যেভাবে দেখেছেন তখনই গানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, 'সদানন্দময়ী কালী', 'তাই শ্যামরূপ ভালবাসি', 'শুকনো তরুমুঞ্জরে না', আর ঠাকুর

রামকৃষ্ণের প্রিয় গান– 'মজিল মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একবার নাটোরের রানি স্বপ্নে দেখলেন, মা তারা তাঁকে বলছেন, 'যুগ-যুগান্ত ধরে এ সিদ্ধপীঠে (তারাপীঠ) আমি বিরাজ করছি। কিন্তু এবার দেখছি, বিদায় না নিয়ে আর উপায় নেই। মন্দিরের পুরোহিত আর তোমার দারোয়ান আমার প্রিয় পুত্র খ্যাপাকে (সাধক বামাখ্যাপা) নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। তাদের এই আঘাত পড়েছে আমারই গায়ে, এই দেখো আমার পিঠে কেমন রক্তের দাগ। আমার পাগল ছেলেকে ডেকে বলেছিলাম, খ্যাপা, আয় আমার সঙ্গে খাবি, তাই সে মন্দিরে ঢুকে খেতে বসেছিল। এই তার অপরাধ। খ্যাপাকে আজ চারদিন প্রসাদ দেয়নি। অনাহারে সে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ওরে, ছেলে না খেলে কি মা খেতে পারে? তাই আমিও রয়েছি উপবাসী।' রানিমা এই কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। মা তখন স্নেহভরে বললেন, 'আচ্ছা, আমি তারাপীঠ ছেড়ে যাব না। কিন্তু এখন থেকে ব্যবস্থা কর, রোজ আমার ভোগের আগে আমার প্রিয় পুত্র খ্যাপাকে খেতে দেওয়া হবে।' দেবীর আদেশে রানিমা পুরোহিত ও দারোয়ানকে তো শাস্তি দিলেনই, সেই সঙ্গে ব্রহ্মময়ী তারা মায়ের আদরের ছেলে মহাভাগ্যবান সাধক বামাখ্যাপাকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পদে বহাল করলেন। নির্দেশ দিলেন 'মায়ের ভোগের আগে মায়ের আদরের ছেলে খ্যাপাকে ভোগ দিতে হবে।' রানিমা'র সেই নির্দেশ মানা হয়।

একদিন ভোর রাতে রানি রাসমণিকে মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'তোর এখন কাশী যাওয়ার দরকার নেই। গঙ্গার তীরে একটি সুন্দরমতো জায়গা ঠিক করে, মন্দির নির্মাণ করে আমায় প্রতিষ্ঠিত কর। নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি তোর নিত্যপূজা নেব।' রানিমা বিস্ময়ে হতবাক। শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছানুসারে ৩১ মে, ১৮৫৫ সালের বৃহস্পতিবার দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম পুজো শুরু করেন রামকুমার।

বাংলা ১২৬২ সালে মায়ের পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন গদাধর (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ)। তাঁর পূজাপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তিনি মাকে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকের গান শোনাতেন। পুজো করতে করতে সমাধিস্থ হতেন। হয়তো মা'র চিবুক ধরে আদর করতেন, কখনও বা ব্যাকুলভাবে মা'কে বললেন, 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, আমাকে দেখা দিবি না কেন? তুই, আমায় দেখা দে মা।' কখনও নিজে আগে ভোগ খেয়ে পরে মা'কে নিবেদন করতেন। ঠাকুরের কথায় দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী কালীতে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখা যায়।

ঠাকুরের সাধনা কালীর আরাধনা। তাঁর কাছে কালীই হলেন আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে নিত্য এবং লীলাময়ী এই দুই রূপেই দেখেছেন। কালী নিত্যরূপে চিরন্তন ও শাশ্বতরূপে বিরাজিতা। আবার লীলাময়ী রূপে তিনি কালের দ্বারা বদ্ধ। এই লীলাময়ী কালীর সময়ের সঙ্গে উৎপত্তি এবং বিনাশ দেখা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ মা-কালীকে রুদ্রতেজের প্রতীক রূপে দেখেছেন, দেখেছেন এক ভয়ংকরী মৃত্যুরূপা রূপে। তিনি উলঙ্গিনী, নৃত্যের ভঙ্গিতে স্বামীর বক্ষে দণ্ডায়মান। তাঁর কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা। খড়্গধারিণী। রক্তপানে উদ্যতা। ভূত-প্রেতের মধ্যে তাঁর অবস্থান। তিনি কৃষ্ণবর্ণা। মুক্তকেশী। তাঁর অট্টহাসি যেন ত্রাসের সঞ্চার করে। তাঁর লেখা– ' ' কবিতায় তারই প্রকাশ দেখা যায় ' / ;/ / / -/ ,

আবার, বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর যুক্তিবাদী মন নিয়েই মা-কালীর মাধুর্যে আত্মহারা হয়েছিলেন। মা কালী ছিলেন তাঁর কাছে তাঁর নিজের মতো। ' ' (১৮৯৮) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন 'জগন্মাতা চোখ বন্ধ রেখে তাঁর সন্তানের সঙ্গে খেলা করেন। আর সারাজীবন ধরে আমরা এই বিশ্বজননীর চোখ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্তে সে সকল রহস্য অবগত হয়, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। এই বিশ্বজননীর চোখ যখন বন্ধ থাকে তখনই আমরা তাঁকে বলি মা-কালী'।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বাল্মীকির মুখ দিয়ে শ্যামা মায়ের রূপের কথা প্রকাশ করেছেন– 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা/ পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুই, না বুঝে মা বলেছি মা' কিংবা সকলের মুখে 'কালী কালী বলোরে আজ/ আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়।'/ মায়ের নামে মনটা যেন ভরে যায়।

কিন্তু কবি নজরুল জাতির সীমারেখা থেকে একসময় সরে গিয়ে সম্প্রদায়গত আইন-কানুন, রীতি-নীতি সব উপেক্ষা করে কেবল ভক্তির মাধ্যমে শক্তির (কালী) আরাধনায় মেতে উঠেছিলেন তাঁর অসংখ্য ধর্মসংগীত মধ্যে শক্তিময়ীর আরাধনায় শ্যাম-শ্যামার স্তবগান করে বললেন– 'আমি শ্যামা মায়ের কোলে বসে/ জপব আমি শ্যামের নাম।' আবার শ্যামা মা'কে লাজুক মেয়ে বলে লিখেছেন– 'আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে/ কেবলি সে লুকাতে চায়।' আবার কালো মেয়ের ক্ষমতা বোঝাতে লিখেছেন– 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়/ দেখে যা আলোর নাচন/ মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব/ যার হাতে মরণ বাঁচন।' এত দরদভরা শ্যামাসংগীত সত্যিই বিরল।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও 'নৈশ অভিযানে' কালীর ভয়াবহ রূপ চিত্রিত করেছেন। যুগে যুগে এভাবেই অগণিত সাধক-সাধিকা, সাহিত্যিক, কবি এবং ভক্তজন মায়ের আরাধনা করে কেউ তাঁর রূপে মুগ্ধ, কেউ তাঁর নামে মুগ্ধ। তাঁর অফুরন্ত করুণা তাই তো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। আকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর আশীর্বাদ ঠিক পাওয়া যাবে। ❑

Durga Ma

Sulov Deb

Durga Ma the Hindu Goddess of War, known as the invincible one. Born from the joint efforts of **Brahma, Vishnu, Shiva**, and many other lesser gods. Moulded for the purpose of defeating the great demon bull **Mahisashura** as the other gods lacked the strength to do so themselves. In charge of vanquishing evil from earth **Ma Durga** was born. In celebration of **Durga Ma's** descent to the world to purge **Mahisashura** we celebrate Durga puja each day of her quest. Although originally the festival was held during what is now called **Bashonthi puja** celebrated by **Shuroth Raja** in his kingdom. But the current date that we celebrate the puja on is when **Sri Ram** prayed to **Ma Durga** out of season when he needed her blessing to defeat his enemy **Ravan** as **Ravan** had gained strength from **Ma Durga's** blessing. In this predicament **Ma Durga** attempted to stop **Ram** from praying by hiding one of the 108 flowers for the ceremony as she favored **Ravan**. **Ram** in his desperation declared if he could not get the last flower he would take out his own eye to replace the flower and convinced **Ma Durga** to give her blessing as **Ram** went to defeat **Ravan**. This tale of heroism inspired everyone who wished for strength and conviction to pray as **Ram** had prayed in hopes for her blessing and changed the date of prayer for the rest of history. ❑

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

[অ : ১২, শ্লোক : ১০]

অনুবাদ ঃ যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তবে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও। কারণ আমার কর্ম করিতে করিতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিবে।

[অ : ১২, শ্লোক : ১০]

Women Empowerment and its significance with Maa Durga

Dia Sanyal

In the present agewomen are becomingstronger every day and they are becoming great leader everywhere. We must ask ourselves, how do we combat gender discrimination? Women have the same potential as men and they tends to be the same or more intelligent than many men. In these situationsif women are challenged, we must ask ourselves, what would Maa Durga do? Maa Durga is a strong and powerful symbol of motherhood, who fought against all evil and protected all creatures. She is the prime example of Shakti and more powerful than any god or goddess combined.

The word "Durga" in Sanskrit means a place which is difficult to overrun. Another meaning of "Durga" is "Durgatinashini," which literally translates into "the one who eliminates sufferings." Maa Durga stands on her lion in the fearless pose called Abhay Mudra, signifying the assurance of freedom from fear.

Her three eyes represent something we all need in life, desire, action and knowledge.Her lion represents power, will and determination. Maa Durga riding the lion symbolizes her mastery over all these qualities.

This suggests that we have to possess all herqualities to get over the demons of ego and pride.

The thunderbolt signifies firmness. This means that we must be firm like a thunderbolt in our opinions and beliefs.The thunderbolt shows that we mustaccept all challenge of our daily life without losing our confidence.

If you notice, the lotus in Maa Durga's hand is not fully bloomed yet. This symbolizes the certainty of success but not its finality. Lotus forms in mud, thus signifying continuous growth in our spiritual quality ina world full of lust and greed.

Each weapon in her hands symbolizes both physical and symbolic destruction against all evil. Now a day, women are abused and mistreated everywhere and everyday despite of their potential.There is no exception even in the land that we call Hindustan as well as within Hindu communities. In order to respect Maa Durga, we must respect all men and women. We must collectively stand together to fight against all the evil andgender discrimination.

If you find yourself being mistreated and discriminated against because of your gender or race, think about what Maa Durga would do today. Use her as a role model and inspiration to conquerthe evilyou face.

Joy Maa Durga and Shuvo Bijoya to all! ❑

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব শ্রীকৃষ্ণ

জয়দেব রায় চৌধুরী

মহামানবদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে যে অগাধ জ্ঞানের প্রয়োজন, তা আমার ক্ষেত্রে সীমিত । কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মীয় গুরু বা মহাপুরুষদের অযৌক্তিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেন, তাই আমি কিছু লিখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। মহামানব বলতে আমরা সাধারণত তাঁদেরকে বুঝি– যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে জনকল্যাণার্থে আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে হয়তো হিটলার-চেঙ্গিস খানকে মহামানব বলতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁদের কথাই বলবো, যাঁরা মানবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মহামানবদের মধ্যে যাঁরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী তাঁদেরকে আমরা ভগবান বলে থাকি।

ঈশ্বর ও ভগবানকে আমরা অনেক সময় এক করে ফেলি, ফলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে ব্যঙ্গোক্তি শুনতে হয় এবং কেহ কেহ সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে না জেনেই অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। এক কথায় বলা যেতে পারে- "ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান, মানবরূপী ভগবান।" ঋগ্বেদে আছে- "ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।" আমরা কেহই ঈশ্বরকে দেখি নাই, তাঁর শক্তি অনুভব করি মাত্র। কিন্তু ভগবানকে অনেকেই দেখেছেন এবং একসাথে কর্মও করেছেন। ভগবানের সংখ্যা একাধিক। যেমন-শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব প্রমুখ।

> মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য– তার প্রধান কারণ, এতে রয়েছে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মহামূল্যবান বাণী দ্বারা রচিত গীতা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন– হে পার্থ! যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি।

পাঠকদের সুবিধার্থে প্রথমে অন্যধর্মীয় কয়েকজন মহামানবের জীবনী তুলে ধরছি।

গড যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টপূর্ব ৬ সালে জেরুজালেমের বেথেলহেম শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল শুক্রবার ৩৫ বছর বয়সে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তবে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস রবিবারে যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান হয় এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁকে দেখতে পান। ১৩ থেকে ৩১ বছর বয়স পর্যন্ত যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বাইবেলে কিছু পাওয়া যায় না। ৩২ বছর বয়সে ব্যাপটিস্ট জন তাঁকে ব্যাপটাইজ করেন। যীশু সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে ঈশ্বরের কথা বলতে থাকেন।

যীশুখ্রীষ্ট যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন সেগুলো হচ্ছে– জলকে মদে রূপান্তরকরণ: এগারজন কুষ্ঠরোগী, একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে, একজন খোঁড়া লোককে, একজন কোঁচকানো হাতবিশিষ্ট ব্যক্তিকে, মৃগীরোগী এক বালককে, চারজন অন্ধব্যক্তিকে, একজন বধিরকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করেন। একজন মৃতা মেয়ে, লাজারাস নামক একজন মৃত ব্যক্তিকে এবং একজন বিধবা মহিলার মৃত ছেলেকে জীবিত করেন। ঝড়ে অশান্ত গ্যালিলি সমুদ্রকে শান্ত করেন। পাঁচটি পাউরুটি আর দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান। যীশুর বাণী– মানুষকে ভালবাস।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ সালের মে মাসে নেপালের লুম্বিনীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ সালের মে মাসে ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বুদ্ধ বলেন, "ব্রহ্মাণ্ডে একটি স্বাভাবিক উত্থান-পতনের নিয়ম রয়েছে– এতে ঈশ্বরের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই।" সুকর্মের ফলে পরম মুক্তি এবং পুনর্জন্মচক্রের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাণ লাভের কথা বলেন। তিনি এই মুক্তির জন্য আটটি পথের কথা বলেছেন– সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক চিন্তা, সঠিক কথা, সঠিক কাজ, সঠিক জীবনধারণা, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক একাগ্রতা ও সঠিক স্মৃতি। বুদ্ধ অলৌকিকত্বের বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তখনকার ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ নিম্নবর্ণের মানুষের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা খুঁজে পায়। বুদ্ধর প্রধান বাণী- অহিংসা পরম ধর্ম।

এবারের দৃষ্টি ফেরাই স্বধর্ম সনাতন ধর্মের প্রতি। সনাতন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য– ত্যাগ, সেবা ও মানবতা। এগুলো এসেছে প্রধানত বিভিন্ন মহামানবের কার্যাবলীর ফলাফল থেকে। যা হোক, শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলাতে অনেকে হয়তো ভাববেন প্রভু বিষ্ণু, প্রভু মহাদেব কিংবা মা কালী সর্বশ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, উনারা দেব-দেবী, মানব নন।

প্রভু বিষ্ণুর ১০ অবতার– মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কলকি। পরশুরাম ২১ বার ক্ষত্রিয় নিধন করে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব শক্তিশালী করেছিলেন। কিন্তু মানবদরদী হিসেবে তাঁর কোন খ্যাতি ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভাতৃপ্রেম, স্ত্রীর এবং প্রজাদের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর আংশিক অবতার আর শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সর্বতঃপূর্ণ, সর্বকর্মকৃৎ। যুদ্ধে রাবণ-পুত্র মেঘনাদ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্র একবার পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনও কোন যুদ্ধে পরাজিত বা আহত হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২৭ সালের ২১ শে জুলাই ভারতের মথুরায় (উত্তর প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১২৫ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল ঘটনাবহুল এবং অলৌকিক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ।

শৈশবে পুতনা বধ, কৈশোরে বৎস, বক, অঘাসুর ইত্যাদি বধ। পরে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, নরক, বান, পৌন্ড্রক প্রভৃতি বহু নৃপাসুর বধ। পরিশেষে কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথীরূপে সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলের নিপাত সাধন।

গোপগণ নন্দরাজকে বলতেছে– "তিনমাসের শিশু পায়ের আঘাতে শকটটি (দু'চাকার গরুর গাড়ী) বিপর্যস্ত করে ফেলল। একবছর বয়সে তৃণাবর্তকে কণ্ঠরোধ করে বধ করলো। সাত বছরের ছেলে কিরূপে অবলীলাক্রমে গিরিরাজ ধারণ করলো? তোমার এই ছেলের বিষয়ে আমাদের বড়ই বিস্ময় ও সন্দেহ হচ্ছে। এইরূপ অলৌকিক অনেক কিছু তিনি দেখিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক ঐশী শক্তির প্রকাশ করলেন, অর্জুনকে প্রদর্শন করলেন বিশ্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক রাজ্য আক্রমণ করেছেন এবং রাজগণকে পরাজিত বা নিহত করেছেন। কিন্তু কেন? তিনি রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়, জিগীষার বশবর্তী হয়ে নয়, দিগ্বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশতও নয়। তিনি ঐ সকল করেছেন লোকরক্ষার্থে, কর্তব্যানুরোধে। রাজ্যজয়ের পর তিনি ঐ সমস্ত সিংহাসন অন্যদেরকে দিয়েছেন– নিজের আয়ত্তে রাখেন নাই।

মথুরার অত্যাচারী রাজা কংস ছিলেন অতি পরাক্রমশালী রাজা জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁর পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করে মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন এবং জ্ঞাতিগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দুরাচারী কংসকে হত্যা করে উগ্রসেনকে সেই রাজসিংহাসনে বসান।

ফলে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ ১৮ বার মথুরা আক্রমণ করেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ (শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ) দ্বারকায় গিয়ে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করে। তৎকালে ভারতবর্ষে বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্য ছিল। ঐ সকল রাজ্যের অধিকাংশই জরাসন্ধের করায়ত্ত ছিল এবং তাঁর সহিত মিত্রতা পাশে বদ্ধ ছিল। মধ্যভারতে চেদিরাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত শিশুপাল, পূর্বাঞ্চলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (আসাম) ভগদত্ত, বঙ্গ ও পৌণ্ড্র দেশে (উত্তরবঙ্গ) বাসুদেব তাঁর মিত্র ছিলেন। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলে পরিচয় দিতেন।

জরাসন্ধ ১০০ রাজাকে ভগবান পশুপতির নিকট বলিদান করার জন্য ৮৬ জন রাজাকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং আরো ১৪ জনকে আনতে পারলেই এই পাশবিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করতেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে জরাসন্ধের নিকট গেলেন। তিনি ঐ সমস্ত বন্দী রাজগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন এবং নরবলি পাপকার্য বিধায় তা না করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু জরাসন্ধ নীতিকথা শোনার বা নতি স্বীকার করার লোক নন। তিনি তিন জনের মধ্যে থেকে ভীমের সাথে যুদ্ধ করার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তের দিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীমসেন কর্তৃক জরাসন্ধ নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জরাসন্ধকে হত্যা করে কৃতিত্ব নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সুনাম চারিদিকে প্রচারিত হোক। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র ভয়ার্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করে সানন্দে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

জরাসন্ধের বিনাশ ও রাজগণের উদ্ধারের পরে মহাসমারোহে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো, কিন্তু একেবারে নির্বিঘ্নে হয় নাই। ভীষ্মদেবের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করাতে শিশুপাল তীব্র বিরোধিতা করেন এবং অন্যান্য রাজগণকে উত্তেজিত করেন। পাণ্ডবগণ ও ভীষ্মদেব থেকে আরম্ভ করে পরিশেষে অকথ্য ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলই শুনলেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না। তদুত্তরে ভীষ্মদেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ কুলশীলে, জ্ঞান-গাম্ভীর্যে, শৌর্য-বীর্যে আদর্শ মানুষ। কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।" এতে শিশুপাল আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং ভীষ্মদেবকে চরমভাবে অপমান করেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে শান্ত করতে ব্যর্থ হন এবং পরিশেষে তাঁকে বধ করেন। তিনি শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

নরকাসুর স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল দখল করলো। রমণীদেরকে ছাড়লো না, তাদেরকে অপহরণ করে তার প্রমোদভবনে রাখলো। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর দুর্দশার কথা বললেন এবং সাহায্য চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের রাজ্য আক্রমণ করলেন। অসংখ্য যাদু দ্বারা বেষ্টিত বাধা অতিক্রম করে অবশেষে নরকাসুরের দুর্গে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধে অতি সহজেই তাকে বধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় ১৬০০০ জন রমণীকে উদ্ধার করেন এবং নরকের পুত্র ভগদত্তকে সিংহাসনে বসান।

শ্রীকৃষ্ণের জনহিতকর কার্যাদি এবং অলৌকিক সমগ্র ঘটনাগুলি তুলে ধরতে হলে অনেক কিছুই লিখতে হবে। তাই সংক্ষেপে বলতে চাই যে, শ্রীকৃষ্ণ দুইটি কার্য উদ্দিষ্ট করেছেন– ধর্মরাজ্য স্থাপন এবং ধর্মপ্রচার। পৌরাণিক অন্যান্য অবতারের অসুর বিনাশ ব্যতীত আর বেশি কিছুর প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতারে দেখা যায়– প্রথমত, দুষ্কৃতিকারী বিনাশ করে সাধুদিগের সংরক্ষণ ও ধর্মরাজ্য স্থাপন; দ্বিতীয়ত, মানবকে দিব্য কর্মের আদর্শ দেখিয়ে দিব্য জীবনের অধিকারী করা, সার্বভৌম ধর্মের প্রচার দ্বারা জীবকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা।

গান্ধারী এবং কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে দোষারোপ করে থাকেন যে, উনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু এ ধারণাটা সঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দণ্ডদাতা হলেও ক্ষমাগুণের পূর্ণাদর্শ; কৌরব-পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিতৈষী। তাই তিনি নিজেই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। প্রথমে তিনি দীনবন্ধু বিদুরের

আতিথ্য গ্রহণ করলেন এবং রাত্রে তাঁদের মধ্যে অনেক কথোপকথন হলো। বিদুর তাঁকে বললেন- "আপনার কৌরবরাজ্যে আসা উচিত হয় নাই, ঐ দুরাত্মা দুর্যোধন আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করবে না।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সৎ পরামর্শ প্রদান না করে, সে কখনো আত্মীয় নয়। দুর্যোধন যদি আমার কথা না শোনেন, তাতেও আমার কোন ক্ষতি নেই। তবে আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান করিয়া কর্তব্য সম্পাদন নিমিত্ত আমার পরম সন্তোষ লাভ হবে।" শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন। তিনি বললেন– "আমি স্বাধীন নই; আমার ইচ্ছেমত কোন কাজ হয় না। আপনারা দুর্মতি দুর্যোধনকে শান্ত করার চেষ্টা করুন।" তৎপর শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ দুর্যোধনকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু তিনি নীতিকথা শুনবার লোক নন। দুর্যোধন বললেন, "জীবন থাকতে সূচাগ্র পরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে প্রদান করব না।"

রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে অনেকে অনেক বিরূপ সমালোচনা করেন। না জেনে কেহ কেহ রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা বা স্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখী বা খেলার সাথী। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলতেন সখা আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলতেন সখী। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিধন করার জন্য যখন রাধাকে ছেড়ে মথুরায় যান তখন তাঁর বয়স ছিল ১০ বা ১১ বছর। আর রাধার বয়স তাঁর চেয়ে ১ বছর বেশী। এই অল্প বয়সে জৈবিক প্রেম-ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ২৮ বছর পর্যন্ত ছিলেন, এর মধ্যে রাধার সাথে তাঁর দেখা হয় নাই। ২৯ বছর বয়সে দ্বারকায় গমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৮৯ বছর। এরপর ৩৬ বছর দ্বারকায় থেকে পরে প্রবাস পাটান নামক স্থানে জারা নামক এক ব্যাধের ভুলের কারণে তীরবিদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, জারা হলেন পূর্বজন্মের রাজা বালীর পুত্র অঙ্গদ।

অনেকেই হয়তো ছবিটি দেখেছেন– একটি পুকুরে কয়েকজন উলঙ্গ যুবতী স্নান করছে আর শ্রীকৃষ্ণ তাদের শুকনো বস্ত্রগুলো নিয়ে একটি গাছে বসে আছেন। ছবিটা দৃষ্টিকটু এবং লজ্জাজনক। একটু চিন্তা করলেই মনে প্রশ্ন জাগে– ঐ পুকুরে পুরুষরাও স্নান করে কিংবা পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। এমতাবস্থায় যুবতীদের উলঙ্গ হয়ে স্নান করা কি যুক্তিসঙ্গত? যুবতীদের প্রত্যেকেরই কি এক সেট বস্ত্র বা কাপড় ছিল– যেগুলো তারা প্রতিদিনই উপরে খুলে রেখে উলঙ্গ হয়ে স্নান করতো? শ্রীকৃষ্ণ ১০ বা ১১ বছর বয়সে মথুরায় চলে যান, তবে গাছে যুবক শ্রীকৃষ্ণ এলো কোথা থেকে? প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হেয় করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ টি নাম। তাঁকে অনেকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন এবং স্নেহ করেন– তাই তাঁরা তাঁকে বিশেষ বিশেষ নামে ডাকেন। এতগুলো নাম আর কোন মহামানব বা মানবের নেই।

মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য– তার প্রধান কারণ, এতে রয়েছে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মহামূল্যবান বাণী দ্বারা রচিত গীতা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন– হে পার্থ! যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ মনুষ্যগণ যে পথই অনুসরণ করুন না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌঁছতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিক, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী ও ধর্ম প্রচারক। তিনি সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের, তপস্বীদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। যিনি এরূপ একাধারে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায় তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ। ❑

তথ্য সংগ্রহ :
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম– শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা– শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
ধর্মের উৎস সন্ধানে– ভবানী প্রসাদ সাহু
Jesus & Muhammad- Mark. A. Gabriel

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

[অ : ৭, শ্লোক : ৯]

অনুবাদ ঃ আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বীদিগের তপস্যা।

[অ : ৭, শ্লোক : ৯]

সার্বজনীন দুর্গোৎসবের নানা দিক
Different Aspects of Durga Puja

ড. কাঞ্চন কুমার পুরোহিত

জীবনের সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই ধর্মীয় অনুশাসন, নিয়মাবলী ও উৎসবসমূহ আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে বিশেষ উৎসবের প্রচলন আছে। সেরূপ সনাতন ধর্মের অনুসারী হিন্দুদেরও একাধিক উৎসব পালনের বিধান আছে। এসব উৎসব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। এসব উৎসবের পিছনে ধর্মীয় কারণ রয়েছে এবং এগুলো নিছক আনন্দ উৎসব নয়।

বাঙালী হিন্দুদের এরূপ একটি ধর্মীয় উৎসব হলো শারদীয় দুর্গাপূজা। এই উৎসবেরও ধর্মীয় কারণ আছে যার মূল বিষয় হলো অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনা করা। ধর্মীয় যে কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এই উৎসব পালিত হয় তা ব্যাখ্যা করা এই ক্ষুদ্র লেখনীর উদ্দেশ্য নয়। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো আমাদের জাগতিক জীবনে এই উৎসবের শিক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধরা যা অপসংস্কৃতির রোধ ও বিবেক জাগ্রত করতে সাহায্য করবে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে আধুনিক জীবন যাপনে সহায়ক হবে।

এই উৎসবের আগমনে আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। আমরা নবমী তিথি পর্যন্ত মায়ের আগমনের আনন্দে মেতে উঠি, দশমী বিদায়ের তিথি। সবার মন আবার দুঃখে ভরে ওঠে। মাকে বিসর্জনের মাধ্যমে বিদায় জানাতে হয়। এ যেন আমাদের জীবন চক্রের মহড়া।

এখন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মাধ্যমে যে সব জাগতিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) পরিবার (Family) : Family is the best organization- এই অন্তর্নিহিত সত্যটি দুর্গাপূজার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। আমরা মা দুর্গাকে তাঁর পরিবারের সকল সদস্য যেমন মহাদেব, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়েই। দেবী জ্ঞান, সম্পদ, শক্তি ও বিপত্তি নামক ক্ষমতা নিয়ে সর্বশক্তির অধিকারিণী। একটি পরিবারের শক্তি বা শ্রীবৃদ্ধি তাই এইসব ক্ষমতা অর্জনের উপর নির্ভরশীল।

(২) সমাজ (Society) : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তারা কখনই একাকী বাঁচতে পারে না। একটা পরিবার যতই সম্পদশালী হউক না কেন তারা সারাজীবন একাকী চলতে পারে না। জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে মানুষের জীবনে সমাজের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সার্বজনীন দুর্গোৎসব সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্র তৈরি করে। এই উৎসব সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার লোকের সমন্বয়ে উদ্‌যাপিত হয়। তাই এই উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে– "Every Person is an Individual".

এই উৎসব পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে (Mutual Respect) সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়।

(৩) শুভ-শক্তির আরাধনা (Prayer for Good Power) : প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ষড় রিপু (Six Evil Power) বিরাজমান। এগুলো মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। আমরা দেবী দুর্গার কাছে ক্ষতিকর রিপুগুলো দমনের জন্য মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রার্থনা করি। মানসিক শক্তি হলো জাগতিক জীবনে অগ্রগতির বড় সোপান। এই শক্তির মূল উৎস হলো– শারদীয় দুর্গোৎসবের শিক্ষা অর্থাৎ–

"In the long-run, Good will Prevail Over the Evils."

(৪) নারী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা (Respect to Woman) : শারদীয় দুর্গোৎসবের কেন্দ্রে আছেন জগৎ জননী মা দুর্গা। তিনি নারী এবং সকল শক্তির আধার। এজন্য গতানুগতিক ভাবে নারীকে দুর্বল ভাবার যে ধারণা অসভ্য সমাজে প্রচলিত তা দূর করে এই উৎসব। এটা নারী সমাজের প্রতি যে বৈষম্য এখনও বিরাজ করছে তা দূর করতে সাহায্য করে।

(৫) যৌথ কর্ম সংস্কৃতির বিকাশ (Development of Corporate Culture) : এই উৎসবে সবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণের সুবিধা আছে। সার্বজনীন উৎসবে একটি কমিটিকে উৎসব পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভক্তবৃন্দ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কমিটিকে অনুষ্ঠান আয়োজনের ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতৃত্ব গড়ে উঠে।

(৬) আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণ (Mixture of Joy and Sorrow) : আমাদের জীবন সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। সুখের পরে দুঃখ ক্রমান্বয়ে আসে। এই উৎসবের আগমনে আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। আমরা নবমী তিথি পর্যন্ত মায়ের আগমনের আনন্দে মেতে উঠি, দশমী বিদায়ের তিথি। সবার মন আবার দুঃখে ভরে ওঠে। মাকে বিসর্জনের মাধ্যমে বিদায় জানাতে হয়। এ যেন আমাদের জীবন চক্রের মহড়া।

তাই বাঙালী হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে এই উৎসব পালন করে আসছে। এই উৎসবের বাহ্যিক আড়ম্বরকে বেশি প্রাধান্য না দিয়ে যদি অন্তর্নিহিত শিক্ষাগুলোকে অনুধাবন করা হয়, তবে এই উৎসব ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আরো বেশি অর্থবহ হবে। ❑

বরুণাদি

শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি তখন তিনি অদিতি, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্ব্বাবরণকারী ভাবি, তখন আকাশ বরুণ।

পুরাণে বরুণ আর আকাশ– দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। ঋগ্বেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Ouranos দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহার অনুল্লঙ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্মে Ouranos আকাশ-দেবতা।

ঋগ্বেদে বরুণের বড় প্রাধান্য। তিনি সচরাচর সম্রাট ও রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বরুণের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা।

> মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য– তার প্রধান কারণ, এতে রয়েছে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মহামূল্যবান বাণী দ্বারা রচিত গীতা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন– হে পার্থ! যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি।

আর এক আকাশ-দেবতা "দ্যৌঃ"। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের "Zeus" এবং "Zeus Pater" হইয়া রোমকদিগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। "দ্যৌঃ" এককালে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইহাকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম "দ্যাবা পৃথিবী"। দ্যৌঃ পিতা, পৃথিবী মাতা। ইঁহাদের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভবিষ্যতে বলিবার আছে। ইঁহারা যে আকাশ ও পৃথিবী ইঁহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না।

আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ইঁহার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, পর্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। লিথুয়ানিয়া বলিয়া রুশ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের লোক আর্য্যবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। এমন কি, বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বুঝিতে পারেন। এই পর্জন্যদেব, সেই প্রদেশে আজিও বিরাজ করিতেছেন। সেখানে নাম Perkunas. সেখানেও তিনি বজ্রবৃষ্টির দেবতা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আর্যজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্যজাতিদিগের পূর্ব পুরুষ, পর্জন্য তাহাদিগের দেবতা। ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারতবর্ষীয় দেবতা। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ইঁহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পর্জন্যের অনেক পরবর্তী।

এক্ষণে সূর্যদেবতাদিগের কথা বলি। সূর্যদেবতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য, সবিতা, পূষা, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বিষ্ণু। সূর্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূর্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই– তিনি কে তা জানি। অন্য সৌর দেবতাদিগের পরিচয় দিতেছি। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী-শাখা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, ঊষা ও প্রাতস্তুতির পর পারম্পর্যের সহিত কতকগুলি সৌর দেবতার স্তুতি আছে। প্রথমে ভগস্তুতি। তারপর পূষার স্তুতি। তারপর অর্যমার স্তুতি। তারপর বিষ্ণুর স্তুতি। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণের অনুবাদের টীকায় ঐ মূর্তি চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "ঊষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল– ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল– অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য।"

"যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজ্য সূর্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্তী সূর্য।"

তারপর অর্য্যমা, অর্য্যমা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন–

"পুষোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল– ইহার পরেই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্বাহ্ণ শেষ হয়।"

"মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

ঋগ্বেদে পূষাকে অনেক স্থলেই "পশুপা" "পুষ্টিম্ভর" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যেভাবে এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্তিতে সূর্য কৃষিধনের রক্ষাকর্তা, পশুদিগের পাতা, পূষা সূর্যের সেই মূর্তি।

কিন্তু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পূষা পথিকদিগের দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

যাহাই হউক, পূষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্মের প্রচলিত দেবতা নহেন।

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই। বেদে যেখানে মিত্রের স্তুতি, সেইখানে বরুণের স্তুতি, –মিত্রাবরুণৌ বেদের দুইটি প্রধান দেবতা। আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি যে বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা মিত্রাবরুণো অব্রুবন ইদং নো বিব্যাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্বরুণো রাত্রিং।" অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না– জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা মিত্র বরুণকে বলিলেন– তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন। ১/৭/১০/১/ সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব বরুণ ইতি উচ্যতে-স হি স্বগমনেন রাত্রিং জনয়তি।" অস্তগামী সূর্য্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।" শতপথব্রাহ্মণে আছে, "অয়ং হি লোকো মিত্রঃ। অসৌ বরুণঃ।" অর্থাৎ ইহলোক মিত্র, পরলোক বরুণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার– তিনি সর্বত্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো করেন মিত্র। সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্য্যজাতি মধ্যেও পূজিত। বরুণ যে গ্রীকদিগের Ouranos তাহা বলিয়াছি। আবার তিনি প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন পারস্যদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজ্‌দ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যেরা সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে। যথা, সিন্ধু স্থানে হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অসুর স্থানে অহুর। এখন সুরাসুর শব্দ যাহারা ব্যবহার করেন তাহাদিগের কথার তাৎপর্য্য এই, অসুরেরা দেবতাগিদের বিদ্বেষী," কিন্তু আদৌ অসুরই দেবতা। অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া "অসুর" হয়। অর্থাৎ আকাশে সূর্য্যে পর্বতে নদীতে যাহাদিগকে প্রাচীন আর্য্যেরা শক্তিশালী লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাঁহারাই অসুর। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ "অসুর" বলা হইয়াছে। এই অহুরমজদ নামের অহুর শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহুরমজদ বরুণ। ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইহার আনুষঙ্গিক দেবতা মিথ্র যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ অল্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে এই মিথ্রদেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আশিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তারা স্বরাজ্য মধ্যে ঐ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবটি উঠিয়া গেল না। উৎসবটি শেষে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (Christmas) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজি এত গাঁদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবরা জানুন বা না জানুন, মানুন বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উৎসব।

আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সূর্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও যে উৎসব আছে– "মকর সংক্রান্তি"– যে দিন সূর্যের মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তবিক এখনকার "মকর সংক্রান্তি", আর যে দিন সূর্যের মকরে যথার্থ সঞ্চার হয়, সে এক দিনই নয়– মকরে প্রকৃত সঞ্চার, "মকর সংক্রান্তি" হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশি পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ "Precesion of the Equinoxes" জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের "মকর সংক্রান্তি" পৌষপার্বণ ও "খ্রীষ্টমাস" একই। কথাটা "আষাঢ়ে" রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছু ছিদ্র নাই।– 'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২০৪-১০। ❑

সূত্র : বঙ্কিম রচনাবলী থেকে সংগৃহীত।

"...Christmas itself, the festival of the birth of Christ or the Divine Son-Sun at the winter solstice, was present in these ancient solar religions of Europe and the Middle East long before the Christian conversion. It was the ancient Vedic winter solstice celebration, the birth of the sacred fire or Agni as the Divine Child to travel the Path of the Gods to the realm of light."

David Frawley; GODS, SAGES and KINGS; Vedic Secrets of Ancient Civilization; Part V: The Greater World Culture, page 288, First Indian Edition 1993, reprint 1995.

সনাতন ধর্মের কিছু তথ্য

দেব কুমার শর্মা

আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের সবচাইতে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, ধর্ম সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকা। এমনকি ধর্ম সম্পর্কে সন্তানদের অনেক প্রশ্নের জবাবও সব সময় হিন্দুরা দিতে পারেন না। ফলে সন্তানরাও তাদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন এবং শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদের মধ্যে বড়দেরই সর্বপ্রথম আপন ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা বা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর এই জ্ঞান অর্জনের সবচাইতে সহজ উপায় হচ্ছে– ধর্ম সম্পর্কিত কিছু বই-পত্র পড়া এবং অপরাপর মানুষের সাথে আলোচনা করা, যাতে পরস্পরের জ্ঞানের আদান-প্রদানে আপনার জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। কোন প্রবন্ধ লিখে বা পড়ে ধর্ম জ্ঞান পড়ানো সম্ভব নহে, তাই সেই প্রচেষ্টা করলাম না। তার পরিবর্তে সচরাচর ব্যবহৃত ও আলোচিত কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো এই ক্ষুদ্র পরিসরে।

> জগৎ সৃষ্টিকারী পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্ম সর্বদাই নিরাকার নিরঞ্জন। তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রথমে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও আকাশ সৃষ্টি হলো। তারপরে তিনি আকাশের নীচে স্তরে স্তরে বায়ু সৃষ্টি করলেন। পরে এই বায়ু থেকে সৃষ্টি হলো তেজ, তেজ থেকে সৃষ্টি হলো জল, পরে জল থেকে সৃষ্টি মৃত্তিকাপূর্ণ পৃথিবী।

১। **গীতা ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা : গীতা বলতেই আমরা শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে গীতাই মনে করি। প্রকৃতপক্ষে কোন মহাপুরুষ কর্তৃক কথিত বা লিখিত কোন ধর্ম উপদেশমূলক বিস্তারিত বিবরণ বা পদ্ধতিকেই গীতা বলা হয়।** উদাহরণস্বরূপ শিব গীতা– দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতি, গুরুগীতা– গুরুর স্তুতি ও পূজা, অষ্টবক্র গীতা অষ্টবক্র মুনির দেয়া ধর্ম জ্ঞান, নারদ গীতা ইত্যাদি। এগুলির কোনটিই শ্রীকৃষ্ণের গীতার অনুরূপ নহে এবং আগমন কালও ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের ঘরে ঘরে সচরাচর পঠিত এবং আলোচিত গীতা মহামুনি ব্যাস রচিত মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব থেকে সংকলিত। এই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে তাঁর বন্ধু ও শিষ্য অর্জুনকে উপদেশ আকারে দিয়েছেন। এখানে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা আসলে সংসার সাগরে জীবন যুদ্ধ এবং জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত চক্র থেকে মুক্তি লাভের জন্যে বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

২। **আমার দেহ, আমি এবং পরমাত্মা :** সাধারণভাবে আমরা এই দৃশ্যমান দেহটাকেই মনে করি আমি। কিন্তু এই দেহের মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং কখনো অনুভব করি না। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বলছি। আমরা বলি– আমার হাত, আমার পা, আমার চোখ, নাক বা কান। তাহলে হাত, পা, নাক, চোখ ইত্যাদি এরা কেউই আমি নই। তবে কি এদের সব কিছু মিলিয়ে যে পূর্ণ শরীর– তা কি আমি। অসুস্থ হলে আমরা বলি– আমার শরীর অসুস্থ। অর্থাৎ বাহ্যিক শরীর নামক রক্ত-মাংসের কাঠামোটা অসুস্থ, আমি নহি। কোন মৃত মানুষের শরীর দেখলে বলি– এটা অমুকের (মৃত ব্যক্তির নাম নিয়ে) মৃত দেহ। অর্থাৎ আমরা অজান্তেই স্বীকার করছি যে– এই দেহটা আমি নই। তা হলে আমি অবশ্যই এই দেহে অবস্থিত অন্য কিছু, মৃত্যুর ফলে যিনি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন– এই বেরিয়ে যাওয়া চেতন শক্তিই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে "আমি"।

এই আমি কে, কোথা হতে এসেছি, মৃত্যুর পরেই বা আমি কোথায় যাই– এই সব চিন্তাই মানুষকে ভাবিয়েছে অনন্তকাল ধরে। এই দেহ হচ্ছে সপ্তধাতু যেমন– শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক নির্মিত জড় কাঠামো। এর সাথে মিলিত হয় পঞ্চভূত অর্থাৎ মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ। এই দুই এর মিলিত শক্তিতেই উৎপন্ন হয় দেহের সকল প্রকার শরীর-ধর্ম, যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গরম, শীত। পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন হয় বলেই এই শরীরকে বলে ভৌতিক দেহ। এই ভৌতিক দেহ নির্জীব ও জড়-স্বভাব সম্পন্ন। এই ভৌতিক দেহের ভিতরে যখন চৈতন্যরূপী জীবাত্মার আগমন ঘটে– তখনই প্রাণী জীবিত হয় এবং তার পরই শুরু নানাবিধ জৈবিক কর্ম। এটাই আমার জীবিত দেহ। তাহলে এখানে "আমার দেহ" ও "আমি" স্বতন্ত্র– কিছুটা হলেও বুঝতে পারলাম এই তথ্য। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এবার "পরমাত্মা" সম্পর্কে একটু ধারণা দেবার চেষ্টা করবো। "আমি"র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানার পরে প্রশ্ন আসে– কে এই আমি? এই দেহ ধারণের পূর্বে আমি কোথায় ছিলাম? তখন সেই শরীরের কি নাম পরিচয় ছিল? এই বর্তমান দেহের মৃত্যু হলে পরে কোথায় যাব? তারপরেই বা কি? কোথায় শেষ পরিণতি? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই মানুষের চিন্তা ধাবিত হল এক অনন্তের সন্ধানে, এক অজানা শক্তির সন্ধানে– যা এসে থামল নিরাকার, নির্গুণ জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম-এর অস্তিত্বে। ক্রমান্বয়ে মানুষ ব্রহ্ম চৈতন্যের সন্ধান পেল, উচ্চ স্তরের সাধক এবং যোগীগণ দর্শন করলেন ব্রহ্মজ্যোতি, পেল মুক্তি বা মোক্ষ লাভের পথের সন্ধান। মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে গেল মানুষ। এবার আমাদেরও সেই পথের সন্ধানের পালা।

৩। **নবচক্র ও কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব :** মানব দেহ অত্যন্ত জটিল এবং নানাভাবে সমৃদ্ধ একটি কাঠামো– যার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনন্ত শক্তি, ক্ষমতা এবং অপরিসীম জ্ঞান। মানবদেহের নবচক্র এমনই একটি তথ্য– এবারে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। মানব দেহের ভিতরে পিঠ বরাবর গুহ্যদেশের থেকে এক ইঞ্চি উপর

থেকে শুরু হয়ে সোজা মাথার পিছন দিকে অর্ধাংশ পর্যন্ত শিরদাড়া বা মেরুদণ্ড অবস্থিত। এই মেরুদণ্ডের ভিতরেই নবচক্রের ছয়টি চক্র অবস্থিত। এই ছয়টি চক্রকে যৌগিক ভাষায় ষড়চক্র বলে। বাকি তিনটি চক্র এর উপরে। মরমী সাধক ফকির লালন একটি গানে– 'আট কুঠুরী নয় দরজা'র কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ের তের নম্বর শ্লোকে বলেছেন–

"সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ৫/১৩

অর্থাৎ– যার অন্তঃকরণ বশীভূত তিনি দেহেন্দ্রিয়াদিকে কোন কর্মে লিপ্ত না করে এবং অন্যকে দিয়ে কোন কিছু না করিয়ে নব-দ্বারযুক্ত শরীররূপ গৃহে সকল কর্ম মন দ্বারা সমর্পণ করে আনন্দ পূর্বক স্থিত থাকেন।

সাধন জগতে অনেক স্থানেই এই ষড়চক্র ও নবচক্রের উল্লেখ আছে, যা উচ্চতর সাধনক্ষেত্রে প্রয়োজন। এবারে এই চক্রসমূহের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

(i) মূলাধার চক্র/পদ্ম : মেরুদণ্ডের একেবারে নিম্নদেশে গুহ্যদেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ উপরে চারিটি দল বা পাপড়িবিশিষ্ট রক্তবর্ণ এই চক্রের অবস্থান। এটাই শক্তির প্রথম আধার, তাই একে মূলাধার বলে। পূর্বে উল্লিখিত পঞ্চ-তত্ত্বের পৃথিবীতত্ত্বের স্থান। এখানে শক্তিরূপী ডাকিনী দেবীর অবস্থান। ক্রিয়াযোগে প্রথমেই এই চক্রের সাধন করতে হয়।

(ii) স্বাধিষ্ঠান চক্র/পদ্ম : মেরুদণ্ডে নীচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে লিঙ্গ মূলে ছয়টি পাপড়িবিশিষ্ট সিন্দুর বর্ণের এই পদ্মটির অবস্থান। এখানেই শরীরস্থ জলতত্ত্বের অবস্থান। এই পদ্মেই চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্রীহরি বিদ্যমান আছেন, যিনি জীবের রক্ষাকারী। এই পদ্মে ধ্যান করে যোগীগণ অহংকাররূপী রিপুসমূহ বিনষ্ট করেন এবং সাধন পথে বিরাট এক ধাপ অতিক্রম করেন।

(iii) মণিপুর চক্র/পদ্ম : মেরুদণ্ডে নীচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থিত দশ পাপড়ি যুক্ত নীলবর্ণ চক্র এই চক্রের অবস্থান নাভীদেশে। ইহাই শরীরস্থ অগ্নিতত্ত্বের অবস্থান। এই চক্রেই রুদ্রমূর্তি মহাকাল বাস করেন।

মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র এবং মণিপুর চক্র– এই তিন অঞ্চল মিলিয়ে শরীরের এই অংশটিকে যোগীরা বলেন পাতাল লোক। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে দেয়া সম্ভব হলো না।

(iv) অনাহত চক্র : নীচের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে অবস্থিত বারটি পাপড়িবিশিষ্ট এই অনাহত চক্র। আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চক্রটি সিন্দুর বর্ণ। এই বারটি পাপড়ি যুক্ত পদ্মের প্রতিটি পাপড়ি মানুষের বিভিন্ন প্রকার অহম্ এবং মনোবৃত্তির প্রকাশক। যেমন– আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোভ, কপটতা, বিতর্ক এবং অনুতাপ। এই চক্রের অধিষ্ঠাত্রি পীতবর্ণা কাকিনী দেবী। এছাড়াও বানলিঙ্গ শিব ও জীবাত্মার বিষয় হংসতত্ত্ব বিরাজমান। সাধকগণ ধ্যানের মাধ্যমে এই চক্রে আরোহণ করে পবিত্র চিন্তার মাধ্যমে এই বারটি অহম্ ও প্রবৃত্তিকে জয় করে আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করেন। এই জন্যেই এই চক্রের গুরুত্ব সাধকদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

(v) বিশুদ্ধ চক্র : একই ভাবে নীচের দিক থেকে মেরুদণ্ডের পঞ্চম স্থানে ষোলটি পাপড়ি/দল বিশিষ্ট এই চক্র বা পদ্মের অবস্থান। শারীরিক দিক থেকে বুক ও গলার মিলন স্থান বরাবর এই চক্রের অবস্থান। এই চক্রের ষোলটি পাপড়িতে রয়েছে সপ্তস্বর যথা– নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, মঞ্চস এবং নয় মন্ত্র/বীজ যথা– ওঁ, হুঁ, ফট্, বৌষট, বষট্, স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত। হং-বীজ প্রতিপাদ্য আকাশ দেবতা এই চক্রে অধিষ্ঠিত।

যোগীগণ ধ্যানের মাধ্যমে এই চক্রে আরোহণ করে জরা ও মৃত্যুভয় জয় করে অনাহত চক্রের দিক ধাবিত হন।

(vi) আজ্ঞা চক্র : ছয় নম্বরে অবস্থিত মেরুদণ্ডের উপরে প্রধানত মূলা বরাবর কপালে দুই ভ্রুর মধ্যখানে এবং একটু উপরে শ্বেতবর্ণ দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞা চক্র অবস্থান করেন। শ্বেতবর্ণ হংসরূপ প্রসারিত দুই দলের পদ্মের উপর একটি ত্রিকোণ মণ্ডল অবস্থিত। এই ত্রি-কোণের তিন কোণে আমাদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই তিনগুণের অবস্থান– শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতায় যার উল্লেখ করেছেন। আর সেই সাথে আছেন– ত্রি-গুণান্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সুন্দর। ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যেই শুক্লবর্ণ চন্দ্র বীজ দীপ্তিমান আছেন। আবার আজ্ঞা চক্রের উপরেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি নাড়ির মিলন স্থান। উল্লেখযোগ্য যে মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, ডানে পিঙ্গলা এবং মেরুদণ্ডের ভিতরে সুষুম্না নাড়ি শরীরের নিম্নভাগ মূলাধার থেকেই উপরে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত চলে এসেছে, কিন্তু কোথাও পরস্পরের সাথে মিলিত হয়নি।

সাধক ও যোগীদের কাছে এই চক্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আজ্ঞা চক্রেরই আর এক নাম জ্ঞান পদ্ম, পরমাত্মা এই চক্রের অধিষ্ঠাতা। ষড়চক্রের সাধনায় যোগী যখন আজ্ঞা চক্রে নিবিষ্ট হন, তখন তিনি ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন লাভ করেন আর এই জ্যোতি রূপই হচ্ছে সাধকের আত্ম-প্রতিবিম্ব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন– বায়ু নিয়ন্ত্রণের সাধন পথে সাধকের বায়ুর ক্রিয়া এখানেই শেষ। পরবর্তী তিনটি চক্রে গমন মাধ্যম হলো জ্যোতি– যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে।

(vii) ললনা চক্র : আমাদের তালুমূলে চৌষট্টি দলবিশিষ্ট রক্তবর্ণের এই ললনা চক্র অবস্থিত– যা অহংতত্ত্বের স্থান। এই চক্রেই শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, সম্ভ্রম, শুদ্ধতা, শোক, খেদ, অরতি এবং ঊর্মি– এই দ্বাদশ বৃত্তি এবং অমৃত বাণী বিদ্যমান।

এই পদ্মে ধ্যান করলে সাধকের পিত্তদাহ, শিরঃপীড়া, শরীরের জড়তা ইত্যাদি দূর হয়।

(viii) গুরু চক্র : মাথার ঠিক মাঝখানে ব্রহ্মরন্ধ্রের কিছুটা নীচে শ্বেতবর্ণ শতদল বিশিষ্ট এই অষ্টম চক্রের অবস্থান। এখানে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল আছে– যাকে যোনিপীঠ ও শক্তিমণ্ডল বলে। এখানে একটি তেজময় বিন্দুর উপর দণ্ডাকার তেজোময় নাদ রয়েছে। এখানেই শ্বেতমাল্য শ্বেতগন্ধ ধারণ করে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে সহগুরু অবস্থান করছেন। তাই একে গুরু চক্র বলে।

সর্বসিদ্ধি লাভ ও দিব্যজ্ঞানের বিকাশের জন্য যোগীগণ এই পদ্মে ধ্যান করেন।

(ix) সহস্রার চক্র : গুরু চক্রের উপরে রক্তিম ও শ্বেত বর্ণ মিশ্রিত সহস্র দল বিশিষ্ট নবম চক্রের অবস্থান। এই চক্রে মোট এক হাজার পাপড়ি আছে, পরপর কুড়িটি (২০) স্তরে এবং প্রতিটি স্তরে পঞ্চাশটি করে পাপড়ি সজ্জিত আছে। এই সহস্রারের কেন্দ্রস্থলে বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ অতি উজ্জ্বল এক বিন্দু বিরাজমান– এই বিন্দুতেই জগৎ উৎপত্তি-পালন-নাশকরণশীল পরম শিব অবস্থান করেন। তাই এস্থানকে শিবক্ষেত্র, কৈলাশ বলা হয়। সাধক যখন ধ্যান যোগে এই স্তরে পৌঁছাতে পারেন, তখন অনন্ত শূন্যের মধ্যে এই অতি উজ্জ্বল বিন্দুরূপ পরম শিব-কে দেখতে পান– এই অপার শূন্যতার জন্যে শৈব সাধকগণ ইহাকেই মহা শ্মশান বলেন। আর সাধারণ মানুষরা জানেন– "শিব থাকেন শ্মশানে।" এই সেই শিবক্ষেত্র মহাশ্মশান, পার্থিব জগতের কোন শ্মশান নহে। এই বিন্দুই তিমিরের সূর্য স্বরূপ পরমাত্মা, সাধকদের জন্য এই বিন্দু দর্শনই "ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার", মোক্ষ লাভ। ইহাই সাধকের চরম লক্ষ্য।

৪। **পঞ্চতত্ত্ব :** সাধন জগতে পঞ্চতত্ত্বের কথা অনেক গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। অনেক সংগীতে পঞ্চ তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। অনেকেই এই পঞ্চ তত্ত্বের সাধনা করেন। তাই সাধারণ পাঠকদের কাছে এই পঞ্চতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

জগৎ সৃষ্টিকারী পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্ম সর্বদাই নিরাকার নিরঞ্জন। তাঁর ইচ্ছাতেই প্রথমে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও আকাশ সৃষ্টি হলো। তারপরে তিনি আকাশের নীচে স্তরে স্তরে বায়ু সৃষ্টি করলেন। পরে এই বায়ু থেকে সৃষ্টি হলো তেজ, তেজ থেকে সৃষ্টি হলো জল, পরে জল থেকে সৃষ্টি মৃত্তিকাপূর্ণ পৃথিবী। দিনে দিনে পৃথিবীতে এলো লতা, গুল্ম, বৃক্ষ এবং জীব। এই পাঁচটি মহাভূতকেই একত্রে পঞ্চভূত বা পঞ্চতত্ত্ব বলে। এই পঞ্চতত্ত্ব থেকেই ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হয়। আবার তা হতেই প্রতি কল্পে জীবনের উৎপত্তি হয়।

আমাদের মানব দেহ ও সকল প্রকার জীব, উদ্ভিদ এই পঞ্চ তত্ত্ব থেকেই উৎপন্ন ও বিলুপ্ত হয়। মৃত্তিকা থেকে– অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক ও লোম– এই পাঁচটি উৎপন্ন হয়। জল থেকে উৎপন্ন হয়– শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র– এই পাঁচটি, বায়ু হতে- ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সংকোচন ও প্রসারণ– এই পাঁচটির উৎপত্তি। আবার অগ্নি হতে উৎপন্ন– নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য– এই পাঁচটি। আকাশ হতে উৎপন্ন হয়– কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা– এই পাঁচটি বৃত্তি।

আকাশের গুণ হচ্ছে শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ। এই পঞ্চ তত্ত্বের প্রভাব মানব শরীরের বিভিন্ন স্থানেও অবস্থিত, যেমন– গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রটি পৃথিবী তত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রে জল তত্ত্বের স্থান, নাভীমূলে মণিপুর চক্রে অগ্নিতত্ত্বের স্থান, হৃদয়ে অনাহত চক্রে বায়ু তত্ত্বের স্থান এবং কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রে আকাশ তত্ত্বের স্থান। সারাদিনে যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন– কখনো বাম নাক দিয়ে, কখনো ডান নাক দিয়ে আপনার শ্বাস প্রবাহিত হয়। প্রতি আড়াই দণ্ড (১ দণ্ড = ২৪ মিনিট) পর পর এই শ্বাস প্রবাহ এক নাক থেকে অপর নাকে পরিবর্তিত হয়। মাঝে মাঝে দুই নাক দিয়েই বায়ু প্রবাহিত হয় অল্প সময়ের জন্য। মনে রাখবেন– এ সময় আপনার দেহে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়েছে। যে কোন সাধন কার্যের জন্য এই সময়টা সবচাইতে ভাল। যোগীগণ বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে দুই নাকে বায়ু প্রবাহের সময়টা দীর্ঘায়িত করেন এবং প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

৫। **চব্বিশ তত্ত্ব বা ইন্দ্রিয় :** জীবের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, অনুভূতি, জ্ঞান, ধর্ম, বিচ্যুতি এবং সিদ্ধির মূলে তার ২৪টি তত্ত্ব জ্ঞান। এগুলো হচ্ছে–

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়– বাক, পাদ, পানি, পায়ু এবং উপস্থ।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক।
পঞ্চ তন্মাত্রা– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।
পঞ্চ ভূত– ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম।

এই কুড়িটি তত্ত্ব জ্ঞান এবং এর সাথে যুক্ত আরও চারটি শক্তিশালী তত্ত্ব, যথা– মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত– মোট এই ২৪টি। উপরিউক্ত ২০টি তত্ত্ব থেকে পাওয়া এবং অনুভূত সংকেত সমূহই বিশ্লেষিত হয় শেষোক্ত ৪ টি তত্ত্বের মাধ্যমে। এসব তত্ত্বের সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে সুন্দরভাবে লিখিত আছে। উৎসাহী পাঠকগণ সেখান থেকে 'আপন' সম্পর্কে জানতে পারেন। কারণ 'আপনা' কে জানাই মানব জীবনের প্রথম সাধনা। আপনার মধ্যেই স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল, আবার আপনার মধ্যেই পঞ্চ তত্ত্ব, আপন শরীরেই রয়েছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকী শক্তি, রয়েছেন সর্ব দেব-দেবীর অবস্থান। প্রয়োজন শুধু অন্তর দৃষ্টিকে উন্মোচিত করা। তবেই সামনে থেকে সরে যাবে অন্ধকার, জেগে উঠবে পরম ব্রহ্মের আলোকময় ভুবন।

৬। **অযোনিজ :** আমরা জানি পৃথিবীতে সকল মানুই মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেন। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণে কিছু ব্যক্তির পরিচয় আছে যারা মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেননি। এমনি পাঁচ জনের নাম আমি সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি। এরা হলেন– অগস্ত্য মুনি, মহাভারতের বীর সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য, পাণ্ডব পত্নী দ্রৌপদী এবং তাঁর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শ্রী রামপত্নী সীতা দেবী।

ঋগ্বেদের মতে অগস্ত্য মুনি তেজময় সূর্য ও বরুণের আদিত্য যজ্ঞের যজ্ঞ কুণ্ড থেকে উদ্ভূত হন। মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কুণ্ড হতে জন্ম নেন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য। পাঞ্চাল রাজা মহারাজ

দ্রুপদের সাথে মহাবীর দ্রোণের অত্যন্ত খারাপ সম্পর্ক ছিল। তাই দ্রুপদ রাজা দ্রোণ হত্যার জন্যে গঙ্গা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই সিদ্ধ ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করেন। তখনই এক পর্যায়ে যজ্ঞাগ্নি থেকে ধর্ম মুকুট খড়গ ও ধনুক ধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং যজ্ঞবেদী থেকে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। সে কারণে এরা দু'জন ভাই-বোন। আর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতি। আর মহাদেবী শ্রীরাম পত্নী সীতার জন্ম কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা। মিথিলার রাজা মীরধ্বজ, যিনি জনক রাজা নামেই পরিচিত, বিশেষ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নিজ হস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় লাঙ্গলের রেখায় এক শিশু কন্যাকে দেখতে পান। তিনি তাকে আপন কন্যা রূপে গ্রহণ করেন এবং নাম রাখেন শ্রীমতী সীতা। এছাড়াও আমরা জানি সপ্তঋষি, দ্বাদশ আদিত্য– এরাও অযোনিজ।

৭। **দ্বাদশ আদিত্য :** আদিত্য বলতে আমরা সূর্যকেই বুঝি। ধর্ম গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের কথা বহু স্থানে বলা আছে। তর্পণ কালেও দ্বাদশ আদিত্যের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকেই এই বার আদিত্য কিভাবে হলো এবং এদের নাম কি জানে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বার আদিত্যের নাম বলা হয়েছে– মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশুমান, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান।

পুরাণ মতে বার জন আদিত্যের সৃষ্টি ও নামকরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– আদিতে সূর্য বা আদিত্য একজনই ছিলেন। সূর্যদেব বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। স্বামী হিসেবে সূর্যদেবের সকল গুণই সংজ্ঞার ভালো লাগতো। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড তেজ তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পিতা বিশ্বকর্মাকে অনুরোধ করেন সূর্যের তেজ কিছুটা কমিয়ে দিতে। বিশ্বকর্মা ভেবে দেখলেন যে সূর্যের তেজ কমিয়ে দিলে জগৎসংসারে নানা অঘটন, অনাবৃষ্টি, শৈত্য প্রবাহ, ফসল হানি ইত্যাদি হবে। তাই সূর্যকে বারটি ভাগে ভাগ করে তেজের বিস্তার ও প্রভাব কমিয়ে সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে এলেন। এই বারটি ভাগকে তিনি বৎসরের বারটি সময়ে প্রকট হবার বিধান করলেন। এগুলিই হচ্ছে বারটি মাস এবং তখন উদিত বারটি আদিত্য। এরা হচ্ছেন যথাক্রমে– বৈশাখে- তপন, জ্যৈষ্ঠে- ইন্দ্র, আষাঢ়ে- রবি, শ্রাবণে- গতস্তি, ভাদ্রে- যম, আশ্বিনে- হিরণ্যরেতা, কার্তিকে- দিবাকর, অগ্রহায়ণে- চিত্র, পৌষে- বিষ্ণু, মাঘে- অরুণ, ফালগুনে- সূর্য এবং চৈত্রে- বেদজ্ঞ এই নামেই উদিত হন এবং এক এক সময়ে এদের তেজের পরিমাণও কম-বেশি হয়। তার ফলেই পৃথিবীতে ঋতু বৈচিত্র্য ঘটে, বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়, পৃথিবী আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে। ❑

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥
[অ : ৬, শ্লোক : ৩৪]

অনুবাদ ঃ হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, দৃঢ় ও প্রবল। ইহার ধর্ম শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ উৎপন্ন করা। সেইহেতু আমি মনে করি, বায়ুকে কোন পাত্রে আবদ্ধ করে রাখা যেরূপ দুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও তেমনি দুষ্কর।
[অ : ৬, শ্লোক : ৩৪]

শ্রীহট্টের রাজচক্রবর্তী-নবদ্বীপের নবদ্বীপচন্দ্র-ভারতের ভারতপ্রদীপ-বিশ্বপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

রেখা পাঠক

মধ্য যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত বর্ষের ইতিহাসে বিশেষ করে বঙ্গ-দেশের ইতিহাসে গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে বঙ্গে অবতারী হওয়া বাংলা তথা ভারত ভূখণ্ডের পতিত পামর মানুষের পার্থিব-অপার্থিব জীবনে প্রথম আলোদানকারী এক ভারত প্রদীপের আবির্ভাব বলে ইতিহাসের মন্তব্য।

'ভূমা' যে এবার অবতারী হওয়ার স্থানটি নির্ধারণ করলেন ভারত ভূমির পশ্চিম বঙ্গে তার কারণ গীতায় ভগবান অবতারী হওয়ার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন সেই প্রেক্ষাপট তখন নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় আড়াইশত বছরেরও বেশি কাল ধরে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাংলায় সনাতন হিন্দুধর্মে এবং হিন্দুর জন জীবনে আগন্তুক পর ধর্মের পীড়নে যে সর্বাত্মক ধ্বংসের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল সেই জোয়ারের মুখেই বাঁধ হয়ে দাঁড়ালেন ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব, সেই নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে, তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক মন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করে।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে নবদ্বীপে পাঠান সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আক্রমণের ফলে হিন্দুর জন-জীবনের একটি ছোট্ট চিত্র তুলে ধরা হল গবেষকের গবেষণা হতে– "Khalji and his soldiers destroyed and plundered many Hindu temples (Murshid, 2006)" খলজি শাসন এইভাবে বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে হিন্দুর মন্দির মূর্তি ধ্বংস করে ছলে-বলে-কৌশলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের করতে থাকে ধর্মান্তরিত। অবশ্য তখন হিন্দু সমাজ-ধর্মেরও নিজস্ব দুর্বলতা ছিল প্রচুর। ঘুণে ধরা বর্ণ প্রথা, তন্ত্র-মন্ত্রের বেড়াজাল, ভক্তিহীন তামসিক ধর্মাচার-ন্যায় তার স্মৃতির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের ফলে সমাজে উচ্চ বর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের ছিল পাহাড় সমান ব্যবধান। নিজ ধর্মে, নিজ সমাজে সম-অধিকার সামাজিক মান-সম্মান ইত্যাদি না পেয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আগন্তুক ধর্মের শুধু বল কিংবা কৌশলের কারণেই নয়– বরং তাদের ধর্মে সম-অধিকারের আশায় দলে দলে নিজ ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে আগন্তুক ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। হিন্দু সমাজ-ধর্মের এই মহতী বিড়ম্বনার যুগে গীতার– "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"– এই প্রতিজ্ঞা বাণী রক্ষার্থে গীতার গুরু শ্রীকৃষ্ণ অবতারী হলেন পলায়নকারী লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপে বাঙালি ব্রাহ্মণ দম্পতির সন্তান হয়ে। তাঁর নাম হল বিশ্বম্ভর, নিমাই, গৌরাঙ্গ, গোরা এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী। জন্মগ্রহণ করে বিশ্বম্ভর দেখলেন তার চারদিকে নিম্নবর্ণের মানুষের মানবেতর জীবন, কানে শুনলেন তাদের হাহাকার আর ক্রন্দন। অন্তরে অনুভব করলেন এমন একটি ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা– যে সংস্কারের দ্বারা উচ্চ বর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের পতিত পামর বা একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে এক উপাস্যের উপাসনা, নামগুণ গান করতে পারবে। একজন মানুষ ধার্মিক হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় আচার-আচরণে এবং উপাসনা গৃহে তার সম-অধিকার থাকতেই হবে। ধর্মীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে সমদর্শিতা, সমমর্যাদা, সম-অধিকার দানের জন্য শ্রীচৈতন্য মাধ্যম করলেন হরিনাম সংকীর্তন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রথম সমাজ সংস্কারমূলক কাজ হরিনাম সংকীর্তন নবদ্বীপের পথে যে ভাবে শুরু করেন তার একটি গবেষণামূলক চিত্র এই– "Chaitanyadev's Reforms : Chaitanyadev (1486-1533) appeared on the scene at this terrible hour of the Bangali Hindus. He preached a single 'Harinam' in place of numerous sectarian doctrines. He started to sing 'Harinam' kirtans on the road of Navadwip with his group, amid the sound of 'khol-karatal'. According to his doctrine, there was no difference between humans. He declared class distinctions as unjustified and gave equal rights to all irrespective of the lower castes by the higher ones. He urged every body to adopt 'Vaishnava' religion based on love and devotion. Responding to his call, scores of people irrespective of caste and class started adopting 'vaishnava' faith. A few muslims also converted. In this way, the tide which was created in favour of Islam returned to 'vaishnavism'. In other words, the conversion process of Hindus stoped and the Hindu religion and society were saved. (Bhowmik, 2006)

হিন্দু সমাজ-ধর্মে চিরদিনের অবহেলিত, অচ্ছুৎ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে শুধু খোল করতাল দ্বারা নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে অহিংস, প্রেম-প্রীতির উৎস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের প্রচার করে শ্রীচৈতন্য দেব পরধর্মের আক্রমণ হতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করলেন। নদীয়াবাসীর জীবন থেকে এত দিনের অমানিশার আঁধার দূরীভূত করে নিমাই শ্রীচৈতন্যদেব হলেন নদের চাঁদ– নবদ্বীপ চন্দ্র।

নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীচৈতন্য তের মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করে নবদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হলেও আসলে তিনি হলেন পূর্ব বঙ্গের শ্রীহট্টিয়া। কারণ তাঁর প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, মাতামহ, মাতা, মাতুলালয় এবং অন্তরঙ্গ পরিকরবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু এবং নাম হরিদাস ঠাকুর ছাড়া প্রায় সবই ছিলেন জন্মসূত্রে শ্রীহট্টের অধিবাসী। এমন কি কঠোর তপস্যা করে আকুল হয়ে কেঁদে কুটে তাঁকে যিনি ভূমিতে অবতরণ করালেন কলির অবতারী রূপে, সেই তাপস শ্রী অদ্বৈতাচার্যের মূল বাড়িও ছিল শ্রীহট্টে। আর তাঁর গুরু পরম্পরার আদিগুরু মহাত্মা মহান শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীরও আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। তাইতো নদের চাঁদ নিমাই নবদ্বীপচন্দ্র সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব যথার্থই শ্রীহট্টের শ্রীহট্টিয়া।

শ্রীহট্টিয়া শ্রীচৈতন্য দেব সম্পর্কে ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন– "এই সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্তী চৈতন্যদেব এবং অন্যতম নেতা অদ্বৈতাচার্য। আমরা সকলে ইহাদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, শাক্তগণ, শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড় কাটা চাষীরাও আজ তাঁহারই করতাল বাজাইতেছে। বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়া লইয়াছে। শ্রীহট্টের এক ব্রাহ্মণ কুমার অনুরাগের রাজদণ্ড লইয়া এই বিশাল ভূভাগ শাসন করিতেছেন।" (সূত্র : বৃহৎ বঙ্গনামক গ্রন্থ হতে)

ব্রাহ্মণ কুমার শ্রীচৈতন্য দেব যে অনুরাগের রাজদণ্ডটি নিয়ে বিশাল বঙ্গভূমির শাসক হয়েছেন সেই অনুরাগ রঞ্জিত রাজদণ্ডটির উৎস কোথায়? এর উৎস হল মানুষের হৃদয় রাজ্যের গভীরতম অনুভূতি যে প্রেম, সেই প্রেমের দণ্ড। এই প্রেমের উৎস ভূমি হল অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ-প্রেম মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের পারমার্থিক জীবনের সব চাহিদা পূরণ করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে অপার্থিব অমৃত মধুর কৃষ্ণ-প্রেম মানবকুলে বিতরণ করা হয়নি। এবার কলিকালে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতারবাদের ধারাবাহিকতায় নিজেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে বাংলায় অবতীর্ণ হয়ে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ নির্বিশেষে সকলকে মধুর কৃষ্ণ-প্রেমের আধারে রঞ্জিত করে সকলকে এক প্রেমের বাঁধনে বেঁধে এক উপাস্যের উপাসনায় এক চাঁদোয়ার তলে এক সমভূমিতে বসিয়ে সমমর্যাদা, সম-অধিকার দান করে হলেন বিশাল বাংলার পতিত জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের রাজা রাজচক্রবর্তী শ্রীচৈতন্য দেব।

শ্রীচৈতন্য দেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম হল পতিত অধম মানুষের ধর্ম। সমাজের প্রথা ভঙ্গের ধর্ম। মানুষে মানুষে পার্থক্য ভাঙ্গার ধর্ম। শ্রীচৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মন্তব্য– চৈতন্য যখন ভক্তি বন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ বাঁধ ভাঙিয়া দিবার কথা বলিলেন– তখন যে হীনবর্ণ সম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।" (সূত্র : ব্যাধি ও প্রতিকার প্রবন্ধ)।

হ্যাঁ, শ্রীচৈতন্যের ধর্মই ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদ ভাঙ্গার ধর্ম। তবে তা এমনি এমনি নয়। একটা মাধ্যম দান করলেন। সে মাধ্যম হল কৃষ্ণ ভজন, হরিনাম সংকীর্তন, প্রেম ভক্তি মার্গ অবলম্বন করে শুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হয়ে কৃষ্ণ ভজন করা। ভক্ত হওয়া, কৃষ্ণ ভক্তের কোন জাত নেই। ভক্তই তাঁর পরিচয়। ভগবৎ ভক্তের কোন জাত নেই এ বিষয়ে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন– "কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই, অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়– চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না। (শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত– পৃঃ-৮৮০)

শ্রীচৈতন্য পতিতকে ভালোবেসেছিলেন বলে পতিত পামররা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্য দিলেন নেতৃত্ব। তাঁর নেতৃত্বে সকলের মিলিত শক্তিতে বাংলা তথা ভারতে প্রথম হল হিন্দু সমাজ-ধর্মের সংস্কার। পতিতকে উদ্ধার করে শ্রীচৈতন্যের নাম হল পতিত পাবন গৌর হরি।

দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন– "বাংলার লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, পতিত জাতিদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব গোস্বামীদের শিষ্য। পূর্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে মোদিনীপুর এবং উত্তরে রংপুর হইতে দক্ষিণে সুন্দরবন এই বিশাল জনপদবাসীরা অধিকাংশই গোস্বামীগণের অধিকারভুক্ত। পাহাড়িয়া টিপ্রা এবং সাঁওতাল গণের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ করিয়াছে এবং যে সকল পার্বত্য জাতি ভালো করিয়া বাংলা বলিতে বা লিখিতে পারে না– তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিম্নভূমিতে প্রবেশ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। বাংলার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে এই সমগ্র সীমানার মধ্যে মহাপ্রভুর খোল করতাল বাজে না এমন স্থান বিরল।"

এভাবে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলা জুড়ে ঘটল শ্রীচৈতন্য দেবের সংস্কার ধর্ম হরিনাম সংকীর্তনের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার। সেই সাথে মধুর চৈতন্য জীবনী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন জানার জন্য বাংলা ভাষায় শিক্ষিত হয়ে উঠল সমতল হতে পাহাড় ভূমির জনগোষ্ঠী।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে শুধু জাতিগত স্পৃষ্টা স্পৃষ্টিই দূর হল না, নিরক্ষররাও অক্ষর জ্ঞান লাভ করে বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য চরিত্রামৃত পাঠ করার যোগ্যতা অর্জন করল। এক কথায় তখন হতে বাঙালির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

পতিতের বন্ধু শ্রীচৈতন্য প্রেমের অবতার। প্রেম কী? প্রেম হল যিনি অখণ্ড ভূমানন্দ, যিনি সর্ব বৃহৎ। সেই ভূমানন্দের সাথে, সেই বৃহত্তমের সাথে মানুষের হৃদয়ের যে গভীর ভাববন্ধন, সেই ভাববন্ধনের নামই প্রেম। মানুষের হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিই প্রেম। প্রেম ছাড়া মানব সমাজ– মানব জীবন মরুভূমিতুল্য। প্রেমই ধর্ম, প্রেমাবতার শ্রীমন মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন– "পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।"

মহাপ্রভুর সময়ে সবই ছিল, ছিল না শুধু প্রেম মহাধন। তিনি প্রেম নিয়ে এলেন, প্রেম বিতরণ করলেন অযাচিতভাবে সর্বস্তরে। বাংলার পথে পথে, বাঙালির প্রাণে প্রাণে ঘরে ঘরে।

কিন্তু প্রেম যে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়–

"গোপনে প্রেম রয় না ঘরে।
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।"

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত পর্যটক শ্রীচৈতন্যদেব রক্ত ঝরা মুক্ত পদে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে তাঁর হৃদয়ের প্রেম আলোর মত ছড়িয়ে দিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দলিত, মথিত, অস্পৃশ্য পতিত চণ্ডালের জীবনে। তাঁর প্রেম ভক্তির আলোয় আলোকিত হল ষোড়শ শতাব্দীর তমসাচ্ছন্ন ভারত ভূখণ্ড। বাংলাকে আলোকিত করে তিনি আলোকিত করলেন বিশাল ভারত ভূমিকে।

মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে বাংলার একজন বাঙালির পক্ষে সমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ষকে তাঁর প্রেমের প্রদীপ শিখায় আলোকিত করা সত্যিই এক বিস্ময়কর বিষয়।

শ্রীচৈতন্যের আলোয় আলোকিত রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের প্রশংসা করে চিঠি পত্রে লিখেছেন– "আমাদের বাঙালিদের মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়া ছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না। তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব প্রেমে বঙ্গ ভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর বিস্তৃত মানব প্রেমে বঙ্গ হতে ভারত বর্ষকে আলোকিত করে তুলেছিলেন তাঁর ভারত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসেরও একই মন্তব্য যে বাংলার প্রথম জ্যোতির্ময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব শুধু বাংলারই নয়– সমগ্র ভারতবর্ষে আলো দানকারী ভারত প্রদীপ শ্রীচৈতন্যদেব। বিজ্ঞ মহলের মতে "ভারত পর্যটক শ্রীচৈতন্য তাঁর অতি স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যেই দেশ-জাতি-বর্ণ উত্তীর্ণ একটি সংস্কারের তরঙ্গ দিয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।" আর বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্ব যে, কামিনী কাঞ্চন হলে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন দ্বারা ভারত বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ ধর্মের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর হাতেই ঘটল হিন্দুধর্মের পুনঃজীবন। মানব প্রেম, মানবতা, সব জীবে সম দর্শিতা, চণ্ডালকে বক্ষে আলিঙ্গন করার প্রবর্তকও তিনিই। ফলে সবের জন্য একেশ্বরবাদী উপাসনা এবং প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। প্রেমের প্রদীপ হাতে নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন ভারতবর্ষের বাংলায়, সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রথম ছয় বছর ভারতবর্ষ পর্যটন করে তাঁর প্রদীপ শিখায় ভারতবাসীকে আলোকিত করে তিনি হলেন ভারতপ্রদীপ শ্রীচৈতন্যদেব। বাংলাকে তথা ভারতকে আলোকিত করে শ্রীচৈতন্য পৃথিবী নামক গ্রহকে আলোকিত করার সংকল্প করলেন এই বলে–

"প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক করি যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥
ইচঃচঃ আদি নবম।

শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্ট হরিনাম সংকীর্তন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দর্শনের মধ্যেই বিশ্ব-প্রেম প্রবাহিত। বিশ্ব-প্রেমের সাথে বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির সুধা ভাণ্ডটিও তাঁর সৃষ্ট বৈষ্ণব রস সাহিত্য। এ বিষয়ে চৈতন্যমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– " বৈষ্ণব ধর্ম প্লাবনের সময়ে বিশ্বপ্রেম যে দিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্চ নীচ, শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহবান করিল, সেই দিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া নিত্য সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।" (সাহিত্য সম্মেলন প্রবন্ধ)

বিশ্ব-প্রেমে, বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, বিশ্বের মানচিত্রের বুকে বসে আছেন শ্রীহট্টের রাজচক্রবর্তী নবদ্বীপের নবদ্বীপ চন্দ্র ভারতের প্রদীপ– বিশ্ব প্রদীপ শ্রীচৈতন্য।

মানব প্রেম মানবতা, সাম্যবাদ সমদর্শিতা, অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা যখন সব কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূলনীতি তখন তাদেরকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে দেখতে হবে পাঁচশত তেত্রিশ বছর আগে বিশ্ববাসীকে কেঁদে কেঁদে এমন করে মানব প্রেমের কথা, অধিকার বঞ্চিতদের কথা, সম-অধিকারের কথা কে শুনিয়েছিলেন। কে নিজের জীবন-যৌবনের সব সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করে কামিনী কাঞ্চনহীন জীবন গ্রহণ করেছিলেন মানুষের কল্যাণে?

আজ বিশ্ব জুড়ে যেভাবে কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মোহ আর অহংকারের ডামাডোল চলছে, এই অবস্থায় মানুষ যদি এ পৃথিবীকে স্বর্গ সুখী করতে চায়, নরহত্যা বন্ধ করতে চায়, তাহলে তাকে শ্রীহট্টের এই রাজচক্রবর্তী, নবদ্বীপের নবদ্বীপচন্দ্র, ভারতের ভারত-প্রদীপ আর বিশ্বের বিশ্বপ্রদীপ কলির যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের বাণীকে গ্রহণ করতেই হবে। অন্যথায় সবুজ ধরণী শুধু রক্তেই লাল হবে।

আজ যুগ সমস্যার সংকটে আসুন শ্রী বিশ্বম্ভর মিশ্র নামক উন্মুক্ত উদার আকাশের নিচে যে আকাশ রবীন্দ্র নাথের ভাষায় এই–

"আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ওকে
সে সুধা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
সে যে বিদীর্ণ বীর হৃদয় হতে
রহিল মরণ রূপী জীবন স্রোতে।
সে যে ওই ভাঙ্গা গড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥

এমনি করে নেচে গেয়ে সীমাহীন অসীম আকাশ শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগের দণ্ড হাতে নিয়ে হালের শ্রীহট্টের রাজচক্রবর্তী নদীয়ার মানুষের দুঃখ দূর করে হলেন নদের চাঁদ। বিশাল ভারত ভূমির আসমুদ্রহিমাচলে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে হলেন ভারত-আত্মা ভারত প্রদীপ। আর বিশ্ববাসীর জন্য অমৃত মধুর অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম আর মানব প্রেমের সুধা ভাণ্ডটি উজাড় করে দিয়ে হলেন বিশ্বপ্রদীপ, বিশ্বমানব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। এমনিভাবে বিশ্বের মানচিত্রে জাগ্রত আছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের হৃদয়ে জাগ্রত বিশ্বের মানচিত্র। ❑

Numerical Notations and the Mystery of Zero

ROBERT K. LOGAN, Ph.D.

The Mystery of the Discovery of Zero

In our review of Mesopotamian, Hebrew, Greek, Roman, and Arab cultures we have seen how the abstract nature of alphabetic writing has provided an environment in which abstract intellectual ideas and social institutions could flourish. The only other notation or system of visual signs that has played as important a role in promoting abstract thought has been the place number system whereby all numbers can be represented by ten numerical signs, the Hindu-Arabic numerals: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. The key to the whole place number system is the zero element or sign, 0, whose invention was an achievement of Hindu mathematics and thought.

Numerical notation and writing systems have always been closely linked. In fact, the first forms of notation were numerical and took the form of tallies etched on bones. This might explain the fact that in the Semitic languages the words for "scribe" and "count" are the same, i.e., SPR. Writing and the notation for abstract numbers emerged in Sumer at precisely the same moment in history, from a common progenitor, clay accounting tokens.

In the earliest alphabetic scripts, Semitic and Greek, for ex-ample, the letters of the alphabet were also used to represent numbers. The first ten letters represented one through ten respectively. The next nine letters represented 20, 30, and so on to 100. This system of numerical notation required virtually all of the letters of the alphabet.

More recent historians of mathematics have been equally surprised. Particularly puzzling to Tobias Dantzig was the fact "that the great mathematicians of Classical Greece did not stumble on it.

The Romans also developed a number system using the letters of the alphabet, but in a more abstract manner. A much smaller number of letters was needed, namely, I, V, X, L, C, D, and M. The system was also more abstract because the numerical values depended to some extent on the placement of the signs. For example IV — 4 whereas VI = 6. There is no zero element in this system and numerical calculations are extremely clumsy. Consider the product 56 X 6 = 336 using Hindu-Arabic and Roman numerals:

56 x 6 = 336 Versus LVI x VI = LXV+VXV+IXV
= L + L + L + L + L
+ V + V+V+V+ V+
V+L+V + 1
= CCCXXXVI

The calculations involving long division or fractions become even more complicated with Roman numerals. The advantages with Hindu-Arabic numbers are obvious.

Arabic numerals are obviously the most abstract numerical notation possible just as the alphabet is the most abstract form of writing. It is ironic that the alphabet achieves its abstraction through phonetization whereas the Arabic numerals are logograms or ideograms that represent ten numerical values including zero. The letters of the alphabet and the Arabic numerals, however, share four important features that enable them to act abstractly:

1. Each system contains a small number of elements; twenty- six letters (for the English alphabet) and ten numerals.

2. Both systems form a complete set. The total set of possible spoken words can be represented alphabetically and any number, no matter how large it may be, can be represented in terms of some combination of the ten numerals 0 through 9.

3. The individual elements of the two systems, the letters and the numerals, are atomic. That is, they are identical and repeatable.

4. The values (sound or numerical) of the aggregate elements (the words or numbers) of the system depend not only on the atomistic components (the letters and numerals) of which they are made up but also on their order. In other words, both the letters and their order determine a word and both the numerals and their order determine a number. For example ON is not the same as NO nor is 18 the same as 81.

The development of the place number system depended on the invention of the concept of zero, an idea that seems extremely simple and yet is quite sophisticated. For this reason, the discovery of the concept of zero is often taken for granted. Many assume that the Greeks, the originators of formal geometry and logic, made use of it. We are taught about zero in elementary school, geometry in high school, and logic in college. Therefore, many people believe logic and geometry are mathematically more sophisticated than the concept of zero. This is not true. The Greeks never developed the operational notion of zero, yet their achievements in geometry and logic were unparalleled. But as a result of not having a concept of Zero, these arithmetic calculations were laborious and their development of algebra was stunted.

Hindu mathematicians invented zero more than 2,000 years ago. Their discovery led them to positional numbers, simpler arithmetic calculations, negative numbers, algebra